১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

বকুল শারদীয়া বসুমতীতে এই উপন্যাস বেরোয়। সম্পাদকের নিকট পরিতৃপ্ত পাঠক-পাঠিকার কত যে অভিনন্দন এসেছে, তার সীমা নেই। বই বেরুবার আগে থেকেই নিউ থিয়েটাস সিনেমায় তোলবার ব্যবস্থা করেন। ঝকঝকে লাইনো· অক্ষরের সুনিপুণ মুদ্রণ। দুই টাকা।

জলজঙ্গল ২য় সং। 'দুর্গম বাদা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপূর্ব জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাদাবনের অধিবাসি-সুলভ প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও দৌরাত্ম্য, উপকার ও উপদ্রব-প্রবণ বিপরীতমুখী ঘটনাসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনী এমন জমিয়া উঠিয়াছে যে বিস্ময় ও ব্যাকুলতার আবেগে রুদ্ধ নিশ্বাসে শেষ অবধি পড়িয়া যাইতে হয়, সমাপ্তিতে পৌঁছাইবার পূর্বে মধ্য-পথে কোথাও দাঁড়াইবার ছেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না'—আনন্দবাজার। চার টাকা।

সৈনিক ৬ষ্ঠ সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ 'সৈনিক' উপন্যাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে'—যুগান্তর। ৩৷৷৹

শ্রীযুত পরিমল গোস্বামী

বন্ধুবরেষু

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল
প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডাস
দুই টাকা

একাকার

মহারাজ মাদুরের উপর মুকুট রেখে হুঁকো টানছেন। ঘেসেড়া ঘেসেড়ানী ঘাসের বোঝা নামিয়ে সেই মাদুরে উবু হয়ে বসে পাখার বাতাস খাচ্ছে। সেনাপতি সতৃষ্ণ চোখে মহারাজার দিকে চেয়ে আছেন তামাকুর একটুকু প্রসাদের প্রত্যাশায়।

মহারাজ বলছেন, বাঁচলাম মুকুট নামিয়ে দিয়ে। ধড়ে প্রাণ এল।

ঘেসেড়া সায় দিল, তা সত্যি। বিষম গরম পড়েছে। ঘাসের বোঝা মাথায় আমার তো ব্রহ্মতালু জালা করছিল মশায়।

মহারাজ বললেন, জ্বালাতন করছিল ছারপোকায়। মুকুটের ভাঁজে ভাঁজে কিলবিল করছে।

ইংরেজিনবিস সেনাপতি মন্তব্য করেন, Uneasy lies the head that wears the crown—

এমন সময় বার্তা এল, লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

হুঁকো থেকে মুখ তুলে মহারাজ সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, যাও—

সেনাপতি বললেন, দিদি একটু—একটা টান টেনে যাই—

মহারাজ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, কাজ নষ্ট করে তামাক টানবে—ইয়ার্কি? মাইনে খাও না?

মন-মরা হয়ে সেনাপতি উঠলেন। ভুড়ুক-ভুড়ুক হুঁকো টানা ছাপিয়ে গুড়ুম-গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ।

কিন্তু মুশকিল, তলোয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। দেয়ালে টাঙানো ছিল, এখন খাপটাই শুধু ঝুলছে। শোনা গেল, মহামাত্য লিচু-বাগানে গিয়ে তলোয়ার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিচু পাড়ছেন।

রাজকন্যা মিষ্টি হেসে বললেন, খাপ তো খাপই সই। কোমরে ঝুলিয়ে নেবেন, খুলতে যাবেন না। লড়াই তো মুখের তম্বি। খাপেই দিব্যি চলে যাবে।

রাজকন্যার হাতে গুলের কৌটা। কথা বলে ফ্যাচ করে কালো পিক ফেললেন ঘরের মেঝেয়। আবার নব উদ্যমে দাঁতে গুল ঘষতে লাগলেন।

নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি! নেটিভ-প্রিন্সরা বেকার বটে, কিন্তু রাজা বসে গুড়ুক খান, মহামাত্য লিচু পাড়েন, রাজকন্যা গুল মাজেন—এতখানি নিশ্চয় নয়।

কি সর্বনাশ! রাজা আর ঘেসড়া এক মাদুরে বসিয়েছেন—রাশিয়া আমদানি করবেন নাকি এ-দেশে?

বুঝতে পেরেছি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান পাঁয়তারা ভাজছে আসলে খাপ ছাড়া তাদের আর কিছু নেই—এই কথাটা হাবে-ভাবে বলতে চেয়েছেন আপনি।

লেখক মৃদু হেসে বললেন, এক যাত্রাদলের সাজঘরে ঢুকে-ছিলাম; অধিকারীর সঙ্গে খাতির ছিল। যা চোখে দেখেছি, হুবহু তাই—একটি কথা বাড়িয়ে লিখি নি। এতটুকু কল্পনা নেই।

চোর

বিন্ধ্যাচলে গিয়ে নামলাম সকাল আটটায়। একা এসেছি। স্ত্রীর অম্বলের ব্যাধি, অনিয়ম এক তিল সহ্য হয় না তাঁর। পুত্রকন্যা এবং আরও কিছু বাক্স-প্যাঁটরা সহ তিনি পরদিন এসে পৌঁছচ্ছেন। ঘণ্টা কুড়িক সময় হাতে, এরই মধ্যে গোছগাছ সারা করে ফেলতে হবে। পাহাড়ের নিচে একটা কূয়োর জল হজমি বলে সুবিদিত। এক কলসি জল আনিয়ে রাখতে হবে সেই দু-মাইল দূর থেকে।

স্যানিটোরিয়ামের মালিকটি বিশেষ বন্ধু আমার। চিঠি লেখা ছিল, ট্রেন থেকে নেমে সর্বাগ্রে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে।

বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছেন তিনি, একটা চাকরও ঠিক করে রেখেছেন। চাকর বাড়িটা চেনে। চাবি ও মালপত্র নিয়ে পৌঁছলাম সেখানে।

মেঝেয় ঝাঁটা পড়তেই দম বন্ধ হয়ে এল। এত ধূলো জমে আছে! নাকে-মুখে তখন গামছা জড়িয়ে নিলাম। চাকর ভাওনাকেও দিলাম আর একটা গামছা। কোমর বেঁধে ধূলো ঝাড়তে লেগেছি।

এক ভদ্রলোক এলেন। সৌম্যদর্শন প্রবীণ ব্যক্তি। গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি ঢুকলেন।

এসে গেছেন, বারাণ্ডায় বসে বসে লক্ষ্য করলাম। উই যে সাদা বাড়ি, লাইনের ও-ধারে পিপুলগাছতলায়, আমি ওখানে আছি। ভাল হল, একজন ভাল প্রতিবেশী পেলাম।

একটা চেয়ার ছিল, ধূলোয় ভরতি, ঝাড়া হয় নি এখনও, তারই ওপর চেপে বসলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত আলাপি। আমি বিরক্ত হচ্ছি মনে মনে, কাজের পাহাড়, গল্প করি কখন? ঠারে-ঠোরে জানালামও সেটা। কিন্তু তিনি আমলে আনলেন না, দীর্ঘ ছন্দে আত্মপরিচয় শুরু করলেন।

লক্ষ্মীকান্ত রায় আমার নাম; পিতা স্বর্গীয় চন্দ্রমণি রায়। আদিবাড়ি বারাসতে, এখন বরানগরে বসবাস। পরশু দিন এসেছি। পূজোর পর এই সময়টায় ভাল এখানে। আরও বার দুয়েক এসেছি, তাই জানি। মাছ মেলে না, মাংস খুব পাওয়া যায়—আর বিলক্ষণ সস্তা। চান করতে গঙ্গায় যাবে

মশায়। কলকাতার গঙ্গা দেখেন, আর এ-ও দেখবেন। জলের রঙ দেখে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে। স্রোত কি রকম! ঘা মেরে মেরে পাহাড় ভেঙে ফেলছে। কিন্তু হলে হবে কি—

সহসা কণ্ঠস্বর অন্য রকম হয়ে গেল; বিরস মুখে তিনি চুপ করলেন। আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম তাঁর দিকে।

সব দিকে ভাল, কিন্তু চোরের বড় উৎপাত। বেটারা মুকিয়ে থাকে—বাঙালি বাবুরা আসেন—এই সময়টার জন্যে।

ইতিপূর্বেই সেটা শুনেছি। স্যানিটোরিয়ামের বন্ধু চাকরটাকে দিয়ে বলেছেন, লোক ভালই হবে মনে হয়। আরও দু-একজনকে দিয়েছিলাম, কেউ মন্দ বলেন নি। তবু চোখে চোখে রাখবেন। এখানকার এই সব লোকদের বিশ্বাস নেই। আমাদের এক-একটা চাকর দশ বছর পনেরো বছর কাজ করছে, তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নে।

লক্ষ্মীকান্তবাবুও দেখছি সেই কথা বলেন। অস্বস্তি লাগল। অমিয়া এসে পড়লে যে বেঁচে যাই! ভারি সতর্ক ও সংসারি, এসে তার সংসারধর্ম বুঝে নিয়ে আমায় অব্যাহতি দিক।

ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, ক'টা বাজল বলুন দিকি? এখানে বাজার আবার এগারোটার আগে বসে না। বাজারে যাব এই পথে।

সময় দেখতে গিয়ে বেকুব হলাম। ঘড়ি যথারীতি বন্ধ হয়ে আছে। বললাম, ঘড়ি মেরামতের দোকান আছে এখানে?

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।—খদ্দের কোথা? ক'জনের

ঘড়ি আছে এদিগরে, তাই বলুন? চেঞ্জাররাই যা দু-দশটা নিয়ে আসে।

তারপর বললেন, সে যাক গে। কত আর হবে? দশটা, কি বলেন? আপনার স্ত্রী এলে নিয়ে যাবেন কিন্তু আমার বাসায়। ওই যে—পিপুলতলার সাদা বাড়ি। স্বামী-স্ত্রী আর দুটো ছেলে, কোন রকম ঝামেলা নেই। মাস তিনেক থেকে যাব ভাবছি। বিদেশ-বিভূঁয়ে বাঙালিদের মিলেমিশে থাকা উচিত, সেই জন্যে মশায় খোঁজ নিতে চলে এসেছি। বলেন তো আমার চাকরটাকেও না হয় পাঠিয়ে দি। চটপট গুছিয়ে দিয়ে যাক।

আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম, এই তো হয়ে এল। কিছু দরকার হবে না। পুরো একটা বেলা রয়েছে, আর লোক কি হবে?

না মশায়, বড় ক্লান্ত হয়েছেন আপনি। ঘাম বেরিয়ে গেছে। একটু জিরিয়ে নিন। চায়ের সব ব্যাপার আছে দেখছি—এক কাপ চা খেয়ে নিন বরঞ্চ। চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাবে। এই, কি নাম তোর? চা করতে পারবি রে বেটা? স্টোভটা জ্বেলে বাবুকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া। হাতটা সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিস।

আমি বললাম, ও কি করবে? বসুন, আমিই করছি। ভাওনা, তুই বাবা স্টোভে কেরোসিন ঢাল্। ঘরের মধ্যে নয়, বারাণ্ডায় নিয়ে যা। যাচ্ছি আমি।

স্টোভ ধরিয়ে জমানো-দুধ সহযোগে দু-কাপ তৈরি করে নিয়ে বৈঠকখানায় এলাম। লক্ষ্মীকান্তবাবু দেখি চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে আমার পকেট-গীতাখানা পড়ছেন। চা এনেছি, হুঁশ নেই। আহ্বান করতে মুখ তুলে এক গাল হেসে বললেন, আমার জন্যে কেন? চা আমি বেশি খাই নে। তা এনেছেন যখন, দিন।

চা খেয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে বাজারের বেলা হয়েছে বুঝে তিনি উঠলেন। যাবার সময় আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন, সস্ত্রীক যাই যেন তাঁর বাসায়।

অমিয়া এসে গেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। পরের দিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ি গেলাম। অমিয়ার এখনও ফুরসৎ হয় নি, একাই গিয়েছি।

শিকল নাড়ছি।—বাড়িতে আছেন?

ক্ষণপরে একজন বেরিয়ে এলেন।

কাকে চাই?

লক্ষ্মীকান্ত রায় মশায়ের এই বাড়ি?

তীক্ষ্ণ চোখে তিনি আমার আপাদ-মস্তক বার দুয়েক দেখে নিলেন। বললেন, কি দরকার বলুন তো? চোরের খুব উৎপাত, তাই শোনাতে এসেছেন? বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, একটু চা খেয়ে নিন—এই তো?

চটে গিয়ে বললাম, বাড়ি পেয়ে যা-তা বলছেন, কেমন

ভদ্রলোক আপনি? লক্ষ্মীকান্তবাবুকে ডেকে দিন, তাঁর সঙ্গে জানাশোনা আছে—

সে অধম এই তো হাজির। কিন্তু মশায়কে বাপের জন্মে দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না। নাম কি আপনার?

অরীন্দ্রসুন্দর ঘোষ—

সকালবেলা তো আর এক অরীন্দ্রসুন্দর এসে সোনার ঘড়ি নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। রূপোর চেনটা পছন্দ হয় নি বোধ হয়, সেটা ফেলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু আর জুত হবে না। চা আমি খাব না, দুয়োরেও ডবল-হুড়কো লাগিয়ে নিয়েছি ছুতোর ডেকে। নমস্কার, আসুন গে মশায়।

অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এলাম। সে মানুষটির দৃক্‌পাত নেই। সশব্দে হুড়কো বন্ধ করলেন।

ফিরে আসতেই অমিয়া বললে, পাঞ্জাবি ঝুলছে, শুধু ঘড়িটা দেখেছি পকেটে। সোনার চেন কি হল, বাক্সে তুলে রেখেছ না কি?

সশঙ্কে পরীক্ষা করে দেখি। অতএব সদালাপী গীতাধ্যায়ী সেই ভদ্রলোকেরই পরিপাটি হাতের ক্রিয়া। অচল ঘড়িটা পছন্দ করেন নি, আমার সোনার চেনে লক্ষ্মীকান্তবাবুর সোনার ঘড়ি তাঁকে বাজারের বেলার সঠিক নির্দেশ দিচ্ছে।

গয়না

ঘোলের শরবৎ দই আর পাতিনেবু এনে রেখেছিলাম বাজার থেকে। খাও, শরীর জুড়োবে। ইস্—কি চেহারা করে এসেছ! আমার কান্না পায়।

কাঠ-ফাটা রোদ্দুর—ঘরে বসে বুঝতে পারছ না। মাথা ফেটে চৌচির হচ্ছে না, সেইটেই আশ্চর্য।

রোদে রোদে ঘুরবে না, এই বলে দিলাম।

অখিলের কৌতুক লাগে এই রকম বেহিসাবি আবদারে।

ঘুরব না—তবে কি বাড়ি বয়ে এসে চাকরি দিয়ে যাবে?

ঘুরে ঘুরেও তো হয় না কিছু। বর্ষা পড়ুক, সৃষ্টি ঠাণ্ডা হোক, তখন চাকরি খুঁজো। এক বাক্স গয়না আছে তো আমার! অত ভাবনা কিসের?

অখিল শিউরে উঠে।

তোমার গয়নায় পেট চালাতে হবে? অসম্ভব।

দায়ে-বেদায়ে লাগে বলেই তো গয়না! কোন কাজে আসবে না তো সোনার বোঝা বয়ে বেড়ানো কি জন্যে?

অখিল উত্তেজিত হয়ে বলল, জীবন যায় সে-ও স্বীকার—তোমার গয়না নিতে পারব না।

সেঁা করে এক চুমুকে শরবৎ খেয়ে নিয়ে ক্লান্তিতে সে শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজে আধ ঘণ্টাখানেক কাটল এমনি। তার পর উঠে বসে চিন্তিত মুখে অখিল বিড়ি ধরাল। সুরমা আয়নায় দাঁড়িয়ে উড়ন্ত চুলগুলো ঠিক করছিল। শৌখিন মেয়ে—সর্বদা ছিমছাম হয়ে থাকতে ভালবাসে।

মৃদু হেসে সুরমা বলে, খুব এক চোট ঝগড়া হয়ে গেল উপরের ফ্লাটের লিলি-দি'র সঙ্গে। লোকে যে কত রকমে শত্রুতা সাধতে চায়! ওর বর নাকি রেসের মাঠে তোমায় দেখে এসেছে।

অখিল বলে, মাঠে নয়—মাঠের পাশে বটতলায়। খিদিরপুরে একটা কাজের খোঁজ পেলাম। লালদীঘি থেকে হেঁটে পাড়ি দেবার সময় জিরিয়ে নিচ্ছিলাম একটুখানি।

তাই বললাম আমি লিলি-দি'কে। তোর বর রেসে যায়, সেইটেই প্রমাণ হল এর থেকে। নইলে সে দেখল কি করে? রাগ করে চলে এসেছি। অকথা-কুকথা শুনতে আর কোন দিন যাচ্ছি না উপরে।

অখিল নিশ্বাস ফেলে বলে, দুপুরের রোদে মাঠ ভেঙে লালদীঘি থেকে খিদিরপুর। দু-পয়সার বিড়ি সম্বল। ধোঁয়া ছাড়া কিছু পেটে পড়ে নি। তুমি শরবৎ তৈরি করে দিলে, অমৃতের মতো লাগল।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুরমা বলে, দেখ তো—ছাই গয়নার বাক্স তবু বয়ে বেড়াতে বলো আমায় ?

কিন্তু অখিল কিছুতে শুনবে না।

জীবন যাবে, তবু নয়। আমার বোতাম-আংটি রয়েছে—তাই বন্ধক দেবো। চাকরি হলে ছাড়িয়ে আনা যাবে।

সুরমারও তেমনি জেদ।

জীবন যাবে তবু তোমার শখের জিনিষে হাত দিতে দেবো না। আমার বলে এত গয়না—

চাটুজ্জে-দম্পতি পাশের ঘরের ভাড়াটে। শনিবারে আজ চাটুজ্জে মশায় সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরেছেন। এদের মনোরম কলহ উপভোগ করছেন তাঁরা দরজার ওধার থেকে।

চাটুজ্জে-গিন্নি বলেন, শুনছ? শুনে শেখো। কানের মাকড়িজোড়া তুমি বেচে দিয়েছিলে, বিয়ের বছরটাও পেরোতে দাও নি—

চাটুজ্জেও বলেন, ছেলেমানুষ বউটি কি বলছে—শোন একটু কান পেতে। বুড়ো হয়ে গিয়েছ—সেই মাকড়ির শোক আজ অবধি ভুলতে পারলে না।

অখিল ঘুমিয়ে পড়লে সুরমা ছুটল উপরতলায় লিলি অর্থাৎ লীলাবতীর কাছে। সাড়া দিতে লিলি বেরিয়ে এল।

এই রাত্রে?

আজকে আবার আংটি-বোতামের বায়না ধরেছে। সব গেছে—শনির দৃষ্টিতে এ দু'টিও থাকবে না। তুই রেখে দে ভাই। কি জানি—তালা খুলে চুরি করে যদি বের করে নেয়! অভ্যাস আছে তো!

দু-চোখে জলের ধারা বইছে। লিলি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল।

সুরমা বলে, আর একটা কথা। তোর বরকে বলে গিল্টির আংটি-বোতাম ঐ রকম এক সেট গড়িয়ে দে ভাই। আমার সর্বস্ব ঘুচিয়ে ও যেমন গিল্টির গয়নায় বাক্স ভরিয়ে রেখেছে, ঠিক তেমনি।

মোহমুদ্গর

নতুন বাসায় পৌঁছেছি সন্ধ্যার পর। ওরই মাঝে এক নজর দেখলাম স্বামীজিকে। তা-ও কি দেখা গেল স্পষ্টভাবে? হেরিকেনের ক্ষীণ আলো—এ বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। খালি পা, বারাণ্ডায় এসে উঠলেন। মীরা তরকারি কুটছিল এ-প্রান্তে, তার পাশে একটা মোড়ার উপর বসে আমি হিসাব ঠিক করছিলাম—মানুষ ও মাল বওয়াবয়িতে মোট কতয় এসে

দাঁড়াল। এমনি সময় স্বামীজি এলেন—মুখ পথের দিকে থাকায় নজর পড়ল। দেখলাম, তাজ্জব ব্যাপার, আসছিলেন ধীর পায়ে অন্যমনস্ক ভাবে—মীরাকে দেখে সুন্দরবনের বাঘের সামনে পড়লে যেমন হয়, সেই রকম অবস্থা। অতি-দ্রুত ঘরের ভিতর চলে গেলেন। ছুটে গেলেন বললে ঠিক হয়। খিল এঁটে দিলেন সশব্দে।

খোলার চালের নিচে আর কখনো থাকি নি তো—রাতে ঘুম হয় নি ভাল করে। বেলা অবধি পড়ে থেকে পুষিয়ে নেবো, কিন্তু সাধ্য কি, ও-ঘরে তুমুল বিক্রমে মোহমুদ্গর পাঠ হচ্ছে, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—

মীরার গা টিপে বলি, শুনছ?

বেশ তো হয়েছে—শুয়ে শুয়ে ধর্মকথা শোনা যাচ্ছে পুণ্যবানের মুখে—

দুঃখিত ভাবে বললাম, বয়সে ছোট—কিন্তু মুক্তিমার্গে কত এগিয়ে গেছেন! আমরা হতভাগা পাপ-পঙ্কে পড়ে রইলাম।

উঠে পড়ল মীরা। সকালের প্রসন্ন আলোয় ভ্রূ কুঁচকাচ্ছে সে। অতএব অনর্থ কিছু ঘটাবার মতলব আঁটছে। চা ঢালল তিন পাত্রে।

উত্তম আবার চা ধরেছে নাকি?

উঁহু, সন্ন্যাসী ঠাকুরের—

উনি চা খান, কে বলেছে?

ছোকরা সন্ন্যাসী—ওরা খায় না আবার কি?

তা হলে চোখের উপরে হল কি করে? কিন্তু এত সব প্রশ্নের তাকত সন্ন্যাসী ঠাকুরের নেই। কোন-কিছু না বলে চুপচাপ বেকুবের মতো বসে রইলেন।

চান-টান তো ভোরবেলা সেরেছেন। উনুনে জল ঢেলে দিয়ে এবারে খেতে বসুন। দেরি করবেন না, আমার অনেক কাজ।

নিতান্ত গোবেচারা সন্ন্যাসী। মীরার প্রতাপে একটা কথা ফুটল না মুখ দিয়ে। সুশীল সুবোধ হয়ে ঘটিতে জল গড়ালেন। পুরো ঘটি উপুড় করলেন উনুনে।

মীরা তাড়া দিয়ে ওঠে, নিচু হয়ে ঢালুন। দেখছেন না, ছাই উড়ছে?

সন্ন্যাসী যথানির্দেশ উনুনের দিকে শির অবনত করে জল ঢালতে লাগলেন।

হয়েছে। বসুন খেতে এবার। হাতটা ধুয়ে নিন আগে ভাল করে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বসব এক্ষুণি—

তারপর সাহস সঞ্চয় করে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আপনি যান তা হলে—

কেন?

কাজ আছে কিনা বললেন—

খাওয়া হয়ে যাক আপনার। তার পরে যাব।

একখানা টুল টেনে নিয়ে সে বসে পড়ল।

সরাসরি প্রশ্ন, সন্ন্যাসী হয়েছেন কেন?

মুখ নিচু করে সন্ন্যাসী গভীর মনোযোগে খেয়ে যাচ্ছেন।

জবাব দিন—

ঈশ্বরের পদাশ্রয়ে পড়ে আছি।

বুঝলাম। কিন্তু আনাড়ি মানুষ বাইরে বেরিয়েছেন কোন ভরসায়? সংসারে কি ঈশ্বর নেই?

সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে বিষম আপত্তি জানালেন।

আজ্ঞে না। সংসার অতি জঘন্য—পূতিগন্ধময় নরক।

মীরা বলে, তাই বুঝি কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে বসেন মড়ি-পোড়ার সুগন্ধ শুঁকতে। সে যাক গে। ঘরের দরজা আজকে খোলা রেখে যাবেন—আপনার স্বর্গধাম একটু সাফ-সাফাই করব।

রায় দিয়ে মীরা উঠল অবশেষে। আর, ওর খরদৃষ্টি এড়ানো সোজা নয়। সন্ন্যাসী যথারীতি তালা দিয়ে বেরুচ্ছেন—এ-ঘর থেকেই যেন হাত গুণে টের পেয়ে গেল।

তালা দিচ্ছেন যে? দামি দামি জিনিষ আছে, নিয়ে সরে পড়ব—তাই ভেবেছেন?

বেকুব হয়ে সন্ন্যাসী আমতা-আমতা করেন।

সে কি কথা! চাবি আপনার কাছে দিয়েই তো যেতাম। এসে পড়েছেন, ভাল হল।

ঘর ঝকঝকে, জিনিষ ক'টি পরিপাটি ভাবে গুছিয়ে রাখা, খাওয়াটাও অতি উপাদেয় হচ্ছে—সন্ন্যাসী আর বিশেষ আপত্তি

করেন না। খেতে বসিয়ে একদিন মীরা বলল, আজকে আপনার বই গোছাচ্ছিলাম। কত পড়েন আপনি—বাপ রে! আচ্ছা গীতার ভিতরে ফোটোগ্রাফ রয়েছে—ওখানা কার?

থতমত খেয়ে সন্ন্যাসী বলেন, স্ত্রীর—

মীরা হেসে ওঠে, স্ত্রীর ছবি বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন—কি রকম সন্ন্যাস?

একটু ইতস্তত করে সন্ন্যাসী বললেন, সত্যি কথা বলি আপনাকে। ওঁরই জন্য আমি সংসারত্যাগী।

কণ্ঠে গভীর বেদনার সুর। শুনে কষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গ মীরা না তুললেই পারত! আদর্শ প্রেমিক—স্ত্রী নেই, সংসার ছেড়েছেন সেই শোকে! সন্ন্যাসী হয়েও তার ছবি দেশ-দেশান্তর বয়ে বেড়াচ্ছেন।

মীরা সরে গেল। তার মন ভরে গেছে। হয়তো বা চোখের জল গড়িয়ে পড়বে—সেইজন্য তাড়াতাড়ি চলে গেল সন্ন্যাসীর সামনে থেকে।

খানিক পরে সবিতা এল শ্যামবাজার থেকে। মীরার শৈশব-সাথী। আমাদের নতুন বাসা দেখতে এসেছে। অভিভূত ভাব কাটে নি তখনো, সন্ন্যাসীর ব্যাপার সে সবিতাকে বলল। তালা খুলে দেখাল সেই স্ত্রীর ছবি।

ছবি দেখে সবিতা চমকে ওঠে। মরবে কেন—এ তো মন্দা, আমার মাসশাশুড়ির মেয়ে। বর সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, শুনেছিলাম বটে! তিনি এখানে? ঢং···বুঝতে পারলি?

জলজ্যান্ত বউটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন, এখন আবার তার ছবি মাথায় করে বেড়ানো হচ্ছে!

দিন আষ্টেক পরের কথা। রাত্রি প্রহর খানেক হয়েছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। গুণগুণ করে বোধ করি মোহমুদ্গরই ভাঁজতে ভাঁজতে সন্ন্যাসী বারাণ্ডায় উঠলেন।

চাবিটা দিন দিদি।

খোলাই আছে ভাই—

ভাই-বোন হয়ে গেছে ওরা এই ক'দিনে। গুণগুণ করতে করতে ঘরে ঢুকে সন্ন্যাসী বলে, আলো দাও নি কেন উত্তম? একটা হেরিকেন···ওরে, বাবা রে—

মীরা খিল-খিল করে হেসে বলল, ভয় পেলে? দেখ না ভাল করে—বাঘ-ভালুক নয়। মন্দা—তোমার মন্দাকিনী।

মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে বসলাম। যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ পাশের ঘরে।

মীরা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হল—বল দিকি?

কি আর হবে! প্রেমালাপ। অনেক দিন পরে দেখা—মান-অভিমানের পালা চলছে।

কিন্তু মুখের আলাপে অমন হুটোপাটি কেন হবে? বাক্স-তক্তাপোশ যেন আছড়ে আছড়ে ভাঙছে।

বললাম, দরজায় শিকল দিয়ে এসো বাইরে থেকে। বেড়া

ভেঙে ঠাকুর অনেক দিন বাইরে বাইরে চরে বেড়িয়েছেন—বোধ হয় শিঙে দড়ি নিতে চাচ্ছেন না।

মীরাও তাই সমীচীন মনে করল। পা টিপে টিপে বারাণ্ডায় গিয়ে শিকল দিয়ে এল।

কিন্তু তাতে মানায় না। সকালে উঠে মন্দাকিনী বোমার মতো ফেটে পড়ে।

একটু আমার ঘুমের আবিল এসেছে, আর সেই ফাঁকে করেছে কি দেখে যান···আচ্ছা, পাই আর একবার কায়দার মধ্যে! হাতে দড়ি, পায়ে দড়ি—কোনরকম আর মায়া-দয়া নেই—

মায়া দেখানো চলে না বটে এ হেন স্বামীকে! করেছে কি—দরজা খুলতে পারে নি তো জানলার শিক খুলে সেখান থেকে পাশের পচা-ডোবার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ঐ দিক দিয়ে পালিয়েছে। প্রাণের পরোয়া করে না, সন্ন্যাসে এমন আকর্ষণ।

* * *

পরদিন এক পোস্টকার্ড এল মীরার নামে। ঠিকানা নেই—এই কলকাতা শহরের কোন এক স্থান থেকে লিখেছে, ডাকের ছাপে বোঝা যাচ্ছে। লিখেছে—দিদি, এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবেন, স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। শান্তির বাসা ভাঙিয়া দিলেন। দাম্পত্য-আলাপন নিতান্তই যদি কানে না গিয়া থাকে, ঘরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিবেন, কেন এ পথে আসিয়াছি। অস্বীকার করিব না—বয়সের দোষে কিম্বা অপরের ঘর-গৃহস্থালী দেখিয়া মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়, সংসারে ঢুকিতে

ইচ্ছা জাগে। তখন ঐ ছবি বাহির করিয়া মন্দাকিনীকে মনে করি। মোহমুদ্গরের চেয়ে অধিক কাজ দেয়।

দুই সখী

দুই সখী—মীনা আর অনুরাধা। ঈশ্বর দেহ আলাদা করে দিয়েছেন, কি করবে—এ দুর্ঘটনায় তাদের হাত নেই, কিন্তু হৃদয় অভেদ। বসে পাশাপাশি, সুযোগ পেলেই ফুসফুস গুজগুজ করে। এত কথা কিসের রে বাপু? কথার মহা-সমুদ্র—সীমা নেই, শেষ নেই। বাড়ি ফিরবে দু'টিতে গলাগলি হয়ে। তখনও কথা। কথার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে

মীনা বলে, আজ আবার পিছু নিয়েছে—

চিমটি কাটল অনুরাধার গায়ে। সে উঃ—করে উঠল। ফিসফিসিয়ে মীনা বলে, ঘাড় বেঁকিয়ে অমনি বুঝি দেখে? তা হলে তো পেয়ে বসবে! ঘাড় ফেরাবি নে, চোখ তুলবি নে—যেমন যাচ্ছি তেমনি চলে যাব পথ ধরে। তবু ওরই মধ্যে দেখে নিতে হবে।

পিছনে বিনুনির ভিতরে একজোড়া চোখ রাখতে হয় তা হলে—

আমি দেখছি কি করে? বলে যাচ্ছি—শোন্। ক্রিম

রঙের ট্রাউজার আর বুশশার্ট—এক নজরে সামনে চেয়ে হাঁটছে। আচ্ছা, তোকেও দেখিয়ে দিচ্ছি—

এক বাড়ির গেটে নানা রকম ফুল ফুটে আছে। মীনা বলে, ফুল পাড়্। পাড়িস না পাড়িস—সেই ফাঁকে দেখে নিবি।

অনুরাধা বলে, জব্দ করতে হবে ওটাকে। কি মুশকিল বল্ তো—

মীনাও সমর্থন করে, এমন শিক্ষা দিতে হবে—কোন মেয়ের কখনও কাছ ঘেঁসতে না আসে!

তাই হল। ঝুমকো-জবা ঝুলছে—একটু উঁচুতে, ঠিক নাগাল পাচ্ছে না। তা ছাড়া নজরটা অন্য দিকে থাকায় হাতেও পৌঁছচ্ছে না ঠিক মতো। তখন এক কাণ্ড হল। কান্তিভূষণ তীরবেগে ছুটে এসে এক লম্ফে গোটা চারেক ফুল তুলে এগিয়ে ধরে, নিন—

চক্ষের পলকে হয়ে গেল এটা। মেয়েদু'টি হতভম্ব। ফুল হাতে নিয়ে তখন সম্বিত হল অনুরাধার। কুটিকুটি করে জুতোয় মাড়িয়ে দিয়ে গটগট করে পাশের গলিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

মীনাদের বাড়ি আর খানিকটা দূরে। এখন সে একা চলেছে। টের পাচ্ছে, কান্তিভূষণ আসছে দূরে দূরে। ম্রিয়মান—মুখ নিচু করে ধীরে ধীরে আসছে। তবু ভাল—অপমান একটু তবে গায়ে লেগেছে! পিছনে মুখ ফিরিয়েই মীনা

দেখল—কান্তির তবু নজর পড়ল না। বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়ায়। কড়া নাড়ছে দরজা খোলার জন্য, আর রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে।

কান্তি কাছে এসে সকরুণ কণ্ঠে বলল, অপরাধটা কি হয়েছিল বলুন তো? ফুল পাড়তে পারছিলেন না, আমি তাই তাড়াতাড়ি—

অপরাধ হল, হ্যাংলার মতো আপনি বড্ড আমাদের পিছন পিছন ঘোরেন।

বাচ্চা চাকরটা দরজা খুলল। জল-কাদা জমে ছিল জায়গাটায়। জুতোর ঠোক্করে আচমকা খানিক কাদা ছিটিয়ে দিয়ে মীনা ঢুকে পড়ল। পাট-ভাঙা শৌখিন জামা কাদায় মাখামাখি। মুখে চোখেও এসে লেগেছে।

তবু কান্তিভূষণ নাছোড়বান্দা।

ক'দিন পরে অনুরাধাকে ট্রামে পেয়ে গেল। বসবার জায়গা নেই—কান্তি কাছে গিয়ে তার সিটের হাতল ধরে দাঁড়াল।

কত আগ্রহে ফুলগুলো হাতে দিলাম, আপনি জুতোর চেপটে চলে গেলেন।

অনুরাধা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মনে মনে। জুতোয় তোমার মুণ্ডটা চেপটে দেওয়া উচিত ছিল। এই ট্রাম অবধি তা হলে ধাওয়া করতে পারতে না।

কিন্তু এক-ট্রাম লোকের মধ্যে এ সব বলা যায় না অতএব নিরুত্তর রইল।

অথচ আপনার বন্ধু মীনা দেবী কত খাতির করলেন আমায়—জুতো মেরে ?

কিন্তু এ ব্যাপারও প্রকাশ করে বলা চলে না এক ভদ্রজনের সম্পর্কে।

স্টপে ট্রাম থামলে কান্তি বলল, নমস্কার !

মীনা কি খাতির করল, বললেন না তো ?

না···না—সে কিছু নয়।

একটুখানি বলে ফেলে যেন ভারি অন্যায় করেছে—কান্তিভূষণের ভাব এমনি। হাসতে হাসতে বলে, খাতির করবেন—তবেই হয়েছে ! দু-জনেই এক রকম আপনারা।

তাড়াতাড়ি সে নেমে পড়ল। এবং যা ভেবেছে—অনুরাধাও নামল তার সঙ্গে।

কান্তি আশ্চর্য হয়ে বলে, লেকে যাচ্ছিলেন মনে হল—দু-আনার টিকিট করলেন।

আমতা-আমতা করে অনুরাধা বলে, একটা কাজ আছে এই দিকটায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

চলতে চলতে প্রশ্ন করল, মীনা জুতোর কাদা ছিটকে দিয়েছিল না আপনার গায়ে ?

কান্তি বলে, বলেছেন বুঝি ? ঠিক তাই। এমন কাদা ছিটকালেন, গালে মুখে মাখামাখি। মুশকিল তখন—লোকের

সামনে বেরোই কি করে সে মুখ নিয়ে ? ওঁদেরই কলতলায় সাবানে ধুয়ে তবে বেরুতে পারি।

অপমানের ব্যাপার বলতে মিটিমিটি হাসে কেন অমন ধারা ? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অনুরাধা বলে, গোটা কয়েক কথা আছে। এখন সময় হবে আপনার ?

কান্তিভূষণ ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে, না। ফুল কিনতে যাচ্ছি, তার পরে আবার—

তার পরে কি ?

মীনা দেবী চায়ে ডেকেছেন।

বলেই ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি সামলে নিচ্ছে, একলা আমাকে নয়—অনেককেই ডেকেছেন।

মুখ কালো করে অনুরাধা বলে, আমাকে কিন্তু নয়।··· তা বেশ, ফুল-টুল নিয়ে যান তবে আপনি—

অপ্রতিভ ভাবে কান্তি বলে, ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই আপনার কাছে চলে যাব—

কাজ নেই। মনে তাড়া থাকলে চায়ের আনন্দ পাবেন না।

আচ্ছা, নমস্কার—

কান্তিভূষণ ব্যস্তভাবে বিদায় নিয়ে যায়।

অনুরাধা ডাকল, শুনুন। কালকে একবার সময় হতে পারে ?

কেন হবে না ? আজই হতে পারত চায়ের পরে। তা বলুন, কোন্ সময় সুবিধে আপনার ?

মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে অনুরাধা বলে, সন্ধ্যাবেলা—এই ধরুন সাড়ে-পাঁচটা ছ'টা—

কান্তিভূষণ ধরে বসল, সিনেমার পাশ পেয়েছি। সিনেমা বসে বেশ কথাবার্তা হবে। আপনি এতে 'না' বলবেন না—

পাশ নাকি শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় নি। টিকিট করেই ঢুকেছে ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বললে দেখা গেল অদূরে মীনা।

অনুরাধা আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি এসেছ—তা তো টের পাই নি—

মীনা কটমট করে তাকিয়ে উঠে পড়ল।

অনুরাধা ডাকে, মীনা!

ততক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে। কান্তি তটস্থ হয়ে বলে, আমি ডেকে আনছি। আপনি বসুন।

বাইরেই পাওয়া গেল মীনাকে। কান্তি বলে, আপনার বন্ধু এত ডাকছেন, শুনতে পেলেন না? আমায় তাই পাঠিয়ে দিলেন।

আমি যাব না—

মোটেই যাবেন না? টাকা দিয়ে টিকিট করেছেন, ছবির শেষ দেখবেন না? কিন্তু সিনেমায় আপনিও আসবেন, সে কথা তো বললেন না—

বললে একখানা বেশি টিকিট করতে বলতেন অনুকে?

তা স্বচ্ছন্দে করতে পারত। পাশাপাশি বসা যেত তা হলে

মীনা বলে, আপনার সঙ্গে ওর নতুন জানাশোনা, আমি ইস্কুলের আমল থেকে জানি। ও যে কি করতে পারে আর পারে না—সমস্ত আমার জানা।

কান্তিভূষণ গদগদ হয়ে বলে, যেমন মিষ্টি মন তেমনি দুর্জয় সাহস! অমন মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায় না।

অমন সর্বনেশে মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই। টের পাবেন ক'দিন পরে। আপনি বললেন সিনেমার কথা, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম আপনাকে—কিন্তু এত সহজে খপ্পরে গিয়ে পড়বেন, সে কি বিশ্বাস হবার কথা?

* * * *

পূরবী বলে, বাজি জিতেছ তুমি কান্তি-দা। দুই সখীতে মুখ দেখাদেখি নেই। দেখা হলেই হুলো-বেড়ালের মতো ফ্যাচ করে ওঠে—

আমার পাওনা?

সত্যি, বিস্তর খরচ হয়েছে তোমার। দু-খানা সিনেমার টিকিট আড়াই টাকা, স্যুট কাচানোর খরচ দু-টাকা, দু-হপ্তা ঘুরে ঘুরে বেড়ানো···। তা হেরে গেছি যখন, সমস্ত দিয়ে দেব।

নিজেকে সুদ্ধু। এত অপমান সয়েছি—মনে করছ, আটটা কি দশটা টাকার লোভে?

যাও—

দাঁড়াও তবে। তোমার কে সখী আছে, খোঁজ নিচ্ছি। আবার এক প্যাঁচ খেলব, তখন আছড়ে পড়তে দিশে পাবে না।

কেষ্টমামা

কেষ্টমামা আসছেন। বুঝলে? ছেলের বিয়ে—দুটো দিন থেকে সওদা করবেন। তাঁর জামাই এসে খবর দিয়ে গেলেন। মামা বুড়োমানুষ, শুদ্ধাচারী—মেসের খাওয়া খেতে পারেন না। তাই বলে গেলেন জামাইবাবু।

চন্দ্রিকা ঘাড় দুলিয়ে বলে, যেতেই বা দেব কেন—আমরা যখন রয়েছি। আপনার লোক দুটো দিনের জন্য এসে যদি এখানে-সেখানে উঠবেন, তবে আর শহরে বাসা করে রয়েছি কেন?

ব্রতীন জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয়—একশ'বার! আমি বলি কি—দোতলার ঘরের জিনিষপত্র সরিয়ে দিই, ঐখানে উনি থাকুন। ডিস্টেম্পার-করা দেয়াল, চারিদিক খোলা—খুশি হবেন। থাকবেন তো দুটো দিন—আমরা কষ্টে-সৃষ্টে নিচের ঘরে কাটিয়ে দেবো। কি বলো?

চন্দ্রিকা রাগ করে বলে, কষ্ট আবার কিসের? নিচের ঘর খারাপ কিসে? কলকাতায় যত নিচের তলার ঘর—সমস্ত বুঝি

খালি পড়ে থাকে, ইঁদুর-আরশুলা কিচকিচিয়ে বেড়ায়? প্রবীণ ধার্মিক মানুষ—তিনি নিচেয়, আর আমরা উপরতলায় মাথার উপরে দুমদাম করে বেড়াব, তাই কি হতে পারে কখনো?

গাড়ি পৌঁছবে আটটা-সাতান্নোয়—তার মানে ন'টাই ধরো। এর মধ্যে রাঁধাবাড়া শেষ করতে হবে, এসেই মুখ-হাত ধুয়ে যাতে বসে যেতে পারেন। পথের কষ্টে তো আধখানা হয়ে আসবেন। তার পরে রান্না চাপাতে হলে অনেক রাত হয়ে যাবে, ক্ষিদেয় কষ্ট পাবেন বুড়োমানুষ—

চন্দ্রিকা পরমোৎসাহে বলে, আমি নিজে রাঁধব। ঠাকুরের রান্না মুখে দিতে পারবেন না কেস্টমামা। পাতে দেবোই বা কেন সে রান্না? কত ভাগ্যে বাসায় তাঁর পায়ের ধূলো পড়ছে—

বাজারে আমি কাল নিজে যাব। জিনিষপত্র দেখে শুনে আনতে হবে, চাকরে পারবে না। ফল আর মিষ্টি-মিঠাই অফিস-ফেরতা নিয়ে আসব।

অফিস থেকে একটু সকাল-সকালই ফিরল। চন্দ্রিকা এরই মধ্যে পাট-ভাঙা গরদের শাড়ি পরেছে, বোধ করি স্নান হয়েছে আর একবার—এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো। কে বলবে, রান্নাঘরে যাচ্ছে সে—পূজোর ঘরে যাচ্ছে না?

তরকারিগুলো নামিয়ে রেখে উনুনে ভাত বসিয়ে চন্দ্রিকা উপরের ঘরে এল, তখন ঠিক আটটা। ব্রতীন মহাব্যস্ত; বিলাতী মেম, কুকুর নিয়ে নেকড়ে-শিকার—এই সমস্ত ছবি

সিঁড়ির ঘরে চালান করে দিচ্ছে। দেয়ালে এনে টাঙিয়েছে দশমহাবিদ্যার ছবি—মা বেঁচে থাকতে যা তিনি আহ্নিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে রেখেছিলেন।

চন্দ্রিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। বলে, ঠিক হয়েছে—এই ছবি দেখলে খুশি হবেন।···স্টেশনে রওনা হও এবার। বলা যায় না—ট্রেন অনেক সময় দশ-বিশ মিনিট আগেও এসে যায়।

ব্রতীন বলে, ছবি সরাবার কথাটা আগে মনে হয় নি। এখনো কাজ কিছু বাকি আছে। তুমি যাও চন্দ্রা, ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও ধরো, এই প্রথম এ-বাড়ি আসছেন—ট্যাক্সি কর আগে। তোমাদের ফিরে আসতে আসতে তার মধ্যে ঘরের কাজ সারা হয়ে যাবে।

চন্দ্রিকা আপত্তি করে। না। সেকেলে মানুষ—বাড়ির বউ একা-একা স্টেশনে রিসিভ করতে গেছে, এ তিনি ভাল চোখে দেখবেন না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও—সাজানো-গোছানো আমি সেরে ফেলব ততক্ষণে।

ব্রতীনও ভেবে দেখল, কথা ঠিক বটে! চন্দ্রিকা চট করে কেমন সব ধরে ফেলে। বলল, দু-জনেই যাই তা হলে। তাতে বেশি খুশি হবেন মামা। ঘর একটু জবড়জং হয়ে রইল—তা হোক গে, কেষ্টমামা তো পর নন।

প্লাটফরমে অপেক্ষা করছে। গাড়ি ঢুকছে স্টেশনে—কুলিরা উঠে দাঁড়াল। অনেকেই আত্মীয়জনকে নিতে এসেছে,

গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে প্রতিটি জানলা লক্ষ্য করছে তারা। গাড়ির দিকে এদেরও নজর, কিন্তু ব্রতীনের বেশি নজর চন্দ্রিকার দিকে। আবার চন্দ্রিকাও অলক্ষ্যে ব্রতীনের দৃষ্টি অনুসরণ করছে।

লোকজন নেমে তিনটে স্রোতের মতো তিন দরজা দিয়ে বাইরে চলল। চন্দ্রিকার কলেজের বন্ধু একটি মেয়ে নামল, কথা বলছে সে তার সঙ্গে। ভিড় বেশ পাতলা হয়েছে।

এমনি সময় ধীরে-সুস্থে এক বুড়ো নামলেন ইণ্টার-ক্লাস থেকে। গায়ে নামাবলী; চেহারায় লালিত্য আছে। একটু ইতস্তত করে ব্রতীন এগিয়ে গেল। দেখা গেল, চন্দ্রিকাও একরকম ছুটে আসছে বন্ধুকে ফেলে। অতএব ইনিই হলেন কেষ্টমামা।

ব্রতীন গড় হয়ে বুড়োর পায়ে প্রণাম করল। চন্দ্রিকাও পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিল।

ভাল আছেন মামা? এইদিকে—গাড়ি এই গেটের কাছে—

বুড়ো ভ্রূকুটি করলেন তাদের দিকে। অল্প আলোয় বই পড়ার মতো করে একবার ব্রতীনের মুখে একবার চন্দ্রিকার মুখের কাছে ঝুঁকে দেখছেন।

ব্রতীন বলে, চিনতে পারলেন না? আপনাদের চন্দ্রিকা। তা স্টেশনের যে রকম আলো, ঠাহর করতে না পারলে দোষ নেই কিছু।

চন্দ্রিকা ফিসফিস করে বলে, আমার নামে চিনতে না-ও পারেন—তোমার নিজের কথা বলো।

বর্ষীয়ান আত্মীয়ের কাছে স্বামীর নাম মুখে আনতে সঙ্কোচ হচ্ছিল—কি জানি, কি মনে করবেন! কিন্তু ব্রতীন যে কিছুতেই বলছে না—তার উপর রাগ করে এবং মরীয়া হয়ে চন্দ্রিকাই শেষ পর্যন্ত বলল, আপনার ভাগ্নে ব্রতীন রায় আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

চোখে ভাল না দেখলেও বুড়োর কান খুব তীক্ষ্ণ, বুঝতে পারা গেল। পিছনে কোন অলক্ষ্য ব্যক্তির উদ্দেশে হাঁক দিয়ে উঠলেন, ও নফরা, কোথায় পিছিয়ে পড়লি রে হারামজাদা? কি বলছে, এদিকে এসে শোন্—

লম্বা-চওড়া পালোয়ান গোছের একজন ছুটে এল। মুখের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, কি হল? চেঁচামেচি করেন কেন দাঁ মশাই?

কোন্ আমার সাতপুরুষের ভাগ্নেরা এসে ছোঁ মেরে গাড়িতে তুলে নিয়ে ভাগতে চায়। দেখ্ দিকি—

নফর কটমট চোখে এদের দিকে চেয়ে বলে, চেহারা তো বেশ ভদ্দরলোকের মতো। জুড়িটিও ভাল ঘরের মেয়ে বলে ঠেকে। তোমরা এই কর্মে নেমেছ?

চন্দ্রিকার চোখে জল আসবার মতো। বলে, কি বলছেন— ছি-ছি! ইনি কেষ্টমামা নন? আমাদের এক মামার আসবার কথা ছিল, তাঁকে দেখতে অবিকল এঁরই মতন—

বুড়ো লোকটি এক গাল হেসে বলেন, বুঝতে পেরেছি, ভেগে পড়ো এবার! চালানি কারবার করি বটে, কিন্তু ট্রাম-ভাড়া

গণ্ডা আষ্টেক ছাড়া বাড়তি সিকি-পয়সাও সঙ্গে রাখি নে। হুণ্ডিতে কাজ-কারবার—গাঁটে মাত্র এক চিরকুট। একবার পকেট কেটেছিলে—হেঁ হেঁ মা-লক্ষ্মী, সেই থেকে সামাল হয়ে গেছি। গাড়িতে নিয়ে তুললে গাড়ি-ভাড়াটাই গচ্চা যেত তোমাদের।

লোক জমেছে মজার আন্দাজ পেয়ে।

কি বলে ?

জোচ্চোর পকেটমার—এ কাজে মেয়েগুলোও নামছে। মেয়ে-পুরুষ মিশিয়ে দল করেছে। দেখুন তো—চেহারা দেখে মালুম পাবেন ?

ব্রতীন চন্দ্রিকার হাত ধরে পাশের দরজা দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়ল। পিছন থেকে শুনতে পাচ্ছে—

এই যাঃ—ছেড়ে দিলেন ? পুলিশে না দেন, পিটিয়ে হাতের সুখ করে নিলেন না কেন ?

সর্ব রক্ষা, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রিকা আর পারে না—সিটের উপর এলিয়ে পড়ল।

৮

পরিচিত গলির মোড়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তার পরে ঝগড়া।

চন্দ্রিকা বলে, মামা চিনতে পারলে না ? ভুল করে কি খোয়ারটা হল, বলো দিকি !

ব্রতীনও গরম হয়ে বলে, চিনবার কথা আমার, না তোমার? তুমি ছুটে আসছ প্রণাম করতে—তাই তো ধরে নিলাম, কেষ্টমামা ইনিই।

চন্দ্রিকা বলে, তোমারই আপন মামা—আমাকে তাই চিনে দিতে হবে! বউ-ভাতের দিন এক নজর দেখেছিলাম—অতগুলো মামাশ্বশুরের মধ্যে ঠিক রাখা যায় নাকি?

ব্রতীন বলে, শুধু কেষ্ট নয়, তিনি হলেন নীল-কেষ্ট। সত্যিকার মামাও নয়, বড় মামার শালা। আমি ভাবলাম, তোমারই কোন মামা হবেন বুঝি! কুশণ্ডিকার পর অনেক মামার পায়েই তো মাথা ঠুকতে হয়েছিল—তার মধ্যে মনে হচ্ছে কেষ্টও ছিলেন একজন।

ভুল করছ—কেষ্ট নয়, রাম। রাম মামা—যিনি ভাঁড়ার আগলাচ্ছিলেন। মা'কে দিদি-দিদি—করেন, আমরা তাই মামা বলে ডাকি।

তখন ব্রতীন বলে, ভুলই হয়েছে সত্যি। সর্বনেশে ভুল। মামা আমার কি তোমার—আগে থাকতে খোলসা করে নেওয়া উচিত ছিল।

আমাদের মেয়েমানুষের দোষ যে পদে পদে! মামাশ্বশুরকে মনে পড়ছে না, কোন্ লজ্জায় বলি সে কথা?

ঐ লজ্জায় আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। তুমি ভাববে, এত তুচ্ছ আমার মামা যে নামটাও মনে করতে পারে না!

বাড়ির দরজায়—এখন হাসি পাচ্ছে আগাগোড়া দুর্ভোগের কথা ভেবে। ঐ যে—সেই জামাইবাবুটি।

ব্রতীন গিয়ে পথ আটকাল।

ছুটছেন কোথা মশায়? কাল যে খবর দিয়ে গেলেন—হ্যাঁ, আপনিই তো—

ভদ্রলোক বললেন, এসে গেছেন। তাঁরই গঙ্গাজল আনতে যাচ্ছি। এসেছেন দশ নম্বর বাড়িতে। লেখার দোষে এক-টা দুয়ের মতো দেখাচ্ছিল—আপনাদের বিশ নম্বরে ভুল করে বলে এসেছিলাম, মাপ করবেন।

কলসিটা কাঁধে তুলে ভদ্রলোক হনহন করে চললেন।

স্মরণে রেখো

বানান করতো 'বিস্মরণ'—

ইজি-চেয়ারে শুয়ে আয়েশে চোখ বুঁজে ছিলাম। তড়াক করে খাড়া হয়ে বসি। আতঙ্কে সর্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে—

পুরাণো এক দৃশ্য। সত্যবান রায় গালে হাত চেপে চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তা দিয়ে ছুটেছে।

হল কি হে ?

ওরে দাদা, বাঘিনী—

শোন, শোন—

ত্রিসীমানায় আর নয়। চললাম। বাক্স-বিছানা পরে পাঠিয়ে দিও।

খেয়ালি মানুষ সত্যবান—আমার আবাল্য সুহৃৎ। ঐ সময়টা সে কিছুদিন আমার বাড়ি এসে ছিল। সকল কাজে ওস্তাদ। ভাল গান 'ায়, তবলা বাজায় আরও চমৎকার। পাখি-শিকারে বেরুল সেকেলে গাদা-বন্দুকটা নিয়ে। এত পাখি মেরে আনল যে পাড়াসুদ্ধ ফিস্টি করেও শেষ করতে পারে না। সরকারি পুকুরে মাছ ধরতে বসিয়ে দিলাম—মিনিটে মিনিটে গেঁথে তুলছে। সর্বশেষে যা গাঁথল, সেটা মাছ নয়—মেয়ে-ইস্কুলের মিস্ট্রেস মঞ্জুলিকা সেন। বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, আর সেই সময়টা সত্যবান ছিপে দিয়েছে টান। মাছ উঠল না, বঁড়শি গিয়ে বিঁধল মঞ্জুলিকার শাড়িতে।

মঞ্জুলিকা নিশ্চল নিশ্চুপ ছবির মতো দাঁড়ালেন, সত্যবান সন্তর্পণে বঁড়শি খুলতে লাগল। মঞ্জুলিকা হেসে বললেন, গায়ে বেঁধে নি ভাগ্যিস। খুব বেঁচে গিয়েছি

তা গায়ে না বিঁধুক, মনে বিঁধেছিল—বাঁচেন নি পুরোপুরি। অনতিবিলম্বে সেটা টের পাওয়া গেল। একদিন হঠাৎ কানে বাজল, 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বলছে। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে পতন—এই রেঃ! চমকে তাকালাম ওদের দিকে।

কিন্তু সম্বোধন ইতিমধ্যে এমন রপ্ত হয়ে গেছে যে বাইরের লোকের এতে বিস্ময়ের হেতু থাকতে পারে, সে বোধশক্তি পর্যন্ত নেই। শ্রীসত্যবানও এত দিনে নারী-কবলিত হলেন—সবাই আমরা অত্যন্ত খুশি।

বেশ চলেছে। হঠাৎ এক টেলিগ্রাম—সত্যবানের বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ। চলে যেতে হচ্ছে—ক'দিনের জন্য তা-ও ঠিক করে বলা যায় না। বিকালের গাড়িতে যাবে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। মঞ্জুলিকার ইস্কুল আবার সাড়ে-দশটা থেকে সাড়ে চারটা অবধি। অতএব সত্যবান সকাল-বেলা সজল চোখে বিদায় নিতে গেল।

এমনি অবস্থায় কথাবার্তার কখনও শেষ হয় না। ন'টা বাজলে অগত্যা মঞ্জুলিকাকে উঠে পড়তে হল। বাকি কথা চিঠিতে হবে। ঘাড় নেড়ে মঞ্জু বলেন, তুমি যা লিখবে—সে জানি। কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যাও। আমি আগে লিখব।

সত্যবান বলে, দেখা যাবে কে লেখে আগে। রাত্রে পৌঁছব, গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-কলম নিয়ে বসব।

টুকরা কাগজে ঠিকানা লিখল—২২ এফ, নিমু মিস্ত্রি লেন। বাহুল্য হলেও তার উপরে নামটা লিখল। এ পর্যন্ত বেশ। কবিত্ব চাগিয়ে উঠল সহসা—উল্টো পিঠে কোণাকুণি লিখতে গেল, 'স্মরণে রেখো'। ফলা-বানানগুলো সত্যবানের তেমন আসে না। তা ছাড়া সেই গদ-গদ অবস্থার মধ্যে ম-ফলা

ব-ফলা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর কখন? এসব পরবর্তী কালে সত্যবান আমায় বলেছে। বলল, ভাববার অবস্থা থাকলে দাদা, 'স্মরণে রেখো' না লিখে 'মনে রেখো' বা যুক্তাক্ষর বর্জিত অমনি একটা-কিছু তো লিখতে পারতাম—

কাগজটুকু যেই মঞ্জুর হাতে দিয়েছে, বিষম এক চড় তার গালে।

চড় মেরে একটু পরেই মঞ্জুলিকা সেন ঠাহর করলেন, ইস্কুলের অর্বাচীন ছাত্রী নয়—ছ-ফুট লম্বা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি এক বিঘত গোঁফ-সমন্বিত প্রেমিক পুরুষ। কিন্তু প্রহার বহু পূর্বেই লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পড়েছে, গালের উপর পাঁচটা না হোক—দু-তিনটে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে, চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তায় ছুটেছে সত্যবান।

আর ক্ষমা হল না। তীরগতিতে ছুটে বেরুল সে স্টেশনে। আর এমনি কাণ্ড—গাড়িও একটা ছিল সেই সময়। কলকাতার নয়, তার উল্টো দিকে। তারই কামরায় উঠে পড়ে গ্রাম ছেড়ে সত্যবান চলে গেল। মঞ্জুলিকা ভুল শোধরাবার ইহজীবনে আর সময় পেলেন না।

তারপর অনেক দিন কেটেছে। ইস্কুলের সেই চাকরি করেন মঞ্জুলিকা আজও। পড়ানোয় খ্যাতি আছে, আমার মেয়েটাকে বাড়িতে পড়ান। 'বিস্মরণ' বানান ধরছেন। সভয়ে আমি উৎকর্ণ

হয়ে আছি। না, মেয়েটা তার কাকাবাবু সত্যবানের মতো নয়। নির্ভুল বলল অত বড় বানানটা।

বুকের উপর থেকে পাষাণ-ভার নামল। সব দোষের ক্ষমা আছে, কিন্তু বানান ভুলের ক্ষমা নেই মঞ্জুলিকা সেনের কাছে।

ভক্ত ও ভগবান

ভগবান শশিমুখীকে ঘরছাড়া করলেন। এ বাজারে ঘর বেহাত হলে নতুন জোটানো অতিশয় দুরূহ। দোতলা মাঠকোঠা—তার নিচের তলায় থাকে। উপরের চেয়ে অনেক ভাল নিচের ঘর। গ্রীষ্মে গরম কম; বর্ষায় ফুটো চালের জল পড়ে উপর-তলায়, নিচে অবধি পৌঁছয় না। ভাড়াও যৎসামান্য—পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকায় ছাউনিওয়ালা আট বাই ছয় পুরোপুরি ঘর একখানা, বুঝুন! লড়াইয়ের সময় পলায়নের হিড়িকের মধ্যে এই জমিদারি বাগিয়ে বসে আছে। আইন খারাপ। কি করবে বাড়িওয়ালা? তক্কে তক্কে ছিল বহুকাল, শেষটা ভগবানের দয়ায় সুরাহা হল।

কোন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিস ঘরে ঢুকে পড়ে বাক্স থেকে কিরণবালা দেবীর হাতের বালা বের করল।

লোকারণ্য। শশিমুখী জপ করছিল, জপে তপে মজ্জে

থাকে অহোরাত্রি। মুখে অবিরাম ভগবৎকথা। তপোভঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে চক্ষু-তারকা বিঘূর্ণিত করে সে বলে, কোন্ আহাম্মক বলেছে, কিরণবালার বালা? নাম লেখা আছে? ভগবান মাথার উপরে। যারা আমার হেনস্তা করছে, আমার সঙ্গে শত্রুতা সাধছে, দেখছেন তিনি—তিনিই জেনে বিচার করবেন।

বটে রে! বড় গাছে লা বেঁধেছিস—নিকুচি করেছে তোর ভগবানের!

অখিল দারোগা গজরাতে গজরাতে তীরের মতো বেরিয়ে গেলেন।

শশিমুখী জনতার অভিমুখে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলছে, কে কি করতে পারে আমার? তিনিই চালিয়ে নিয়ে বেড়ান, সুখে দুঃখে সব সময়ের বন্ধু। সমস্ত তিনি দেখতে পান, কোন-কিছু লুকোছাপা নেই।

উপর থেকে অখিল দারোগার সোল্লাস চিৎকার এল, ধরেছি ভগবানকে—

এবং অনতিপরে হাত বেঁধে টানতে টানতে ভগবান রাহুতকে নিচে নিয়ে এল। বিখ্যাত সিঁধেল চোর, তিন বছরের ফেরারি।

অখিল দারোগা গর্বে ফেটে পড়েন।

ও-বেটী বলেছে ঠিক কথা। দেখছিল সত্যই উপর থেকে। দেখুন না ছাতের ফুটো, তাকিয়ে ছিল ঐ ফুটো দিয়ে। কথা শুনে আমার সন্দেহ হল, পা টিপে টিপে ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘ্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরলাম। টের পেলে ভগবান

ঠিক নিচে লাফ দিত। জেলখানার পাঁচিল টপকাল যে মানুষ, ঐটুকু উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়বে, এ আর কঠিন কি!

ছোট দারোগা হামিদ রসুল শশিমুখীকে দেখিয়ে বললেন, এটাকেও বাঁধুন। সাকরেদ। স্বীকার করেছে, একে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় নাকি ভগবান—

অখিল নিম্নকণ্ঠে বলেন, তবু ধরিয়ে দিল তো! স্পষ্ট বলে দিল, মাথার উপরে রয়েছে। খারাপ ব্যবহার করে কাজ নেই, অ্যাপ্রুভার হবে।

শশিমুখী ও ভগবানকে একসঙ্গে নিয়ে চলল। বাড়িওয়ালা চেঁচিয়ে বলে, ভক্তের বাক্সটাও নিয়ে যান দারোগাবাবু। আমার বাড়িতে জায়গা হবে না।

তারপর টানতে টানতে নিজেই বাক্সটা বাইরে এনে দরজায় তালা এঁটে দিল।

জমাখরচ

ছোট মেয়ের বিয়ের রাত্রে রসময়বাবু আকস্মিকভাবে মারা গেলেন। মন্ত্র-পড়া এবং কনের পিঁড়ি ঘোরানো ইত্যাকার অনুষ্ঠানগুলো হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষা। হঠাৎ কি হল— কোন ডাক্তার তার হদিস পায় না।

দাহ করে আগুনে হাত-পা সেঁকে নিমপাতা চিবিয়ে এবং লোহা ছুঁয়ে পরের দিন দুপুরে ওঁদের বৈঠকখানায় বসেছি, সদ্যবিধবা যোগমায়া দেবী এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হন। রসময়বাবুর গুণপনার কত কথাই যে বললেন! তার পরে চোখ মুছে বললেন, দেখ তো, পাওনা-থোওনা কার কাছে কি আছে? সমস্ত জমাখরচ আছে ওঁর। আমার চোখ ভাল নয়, তুমি ভাই পড়ে দেখ একটু ভাল করে।

চোখ ভাল থাকলেও তিনি পড়তে পারতেন না। অক্ষর চেনেন না, সে আমি জানি। কিন্তু কি বিপুল কাণ্ড করে গেছেন রসময়বাবু! খেরো-বাঁধা বড় বড় খাতায় প্রকাণ্ড এক আলমারি ভরতি। প্রথম জীবন থেকে প্রতিটি দিন প্রত্যেকটি পাই-পয়সার হিসাব রেখে গেছেন। কোন্ মনিব আছেন কোথায়—তাঁর কাছে দাখিলের জন্য কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব তৈরি। পাওনার খোঁজ পেলাম না, কিন্তু রসময়বাবু কি রোগে মরেছেন, সেটা যেন ধরি-ধরি করছি। জমাখরচ থেকে রোগের নিদান-নির্ণয়। ইতস্তত কয়েকটা হিসাব তুলে দিচ্ছি, আপনারাও দেখুন—

২৮শে বৈশাখ—

বড় মেয়ে কুন্তী ছবি আঁকিবে। ঐ বাবদ মাস্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। ৪৲

কুন্তীর সাবান গন্ধতেল স্নো ক্রীম পাউডার ও জুতা একুনে ১৩৷৶১০

১২ই জ্যৈষ্ঠ—

চা এক পাউণ্ড
বিস্কুট এক টিন
মাখন এক কৌটা
ময়দা /২॥
ঘৃত /১ ৪৸০

২রা আষাঢ়—

চিত্রলেখার মাস্টারের এক মাসের মাহিনা ২৫৲
চিত্রলেখা ও মাস্টার মহাশয়ের সিনেমার টিকিট ২॥০
ঐ বাবদ ট্যাক্সি ভাড়া ইত্যাদি ৩।৶০
(কুন্তীর নাম চিত্রলেখা হল বুঝি ! ছবি আঁকে সেই কারণে ?)

৪ঠা শ্রাবণ—

চিত্রলেখার পাকা দেখার খরচ মোট ২০।৶০
শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ছাপা ৪॥০

২২শে শ্রাবণ—

শুভবিবাহে মোট ব্যয় (খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ হেতু নিমন্ত্রিতবর্গকে চিনাবাদাম ভাজা দেওয়া হইয়াছিল) ১২৭॥৵০

২৪শে শ্রাবণ—

মেজ মেয়ে খুকি গান শিখিবে। ঐ বাবদ গানের ইস্কুলে ভরতি করিবার ব্যয় ২৫৲
হারমোনিয়াম ৬৫৲
(বিয়ের হাঙ্গামা মিটতে না মিটতেই ! অকারণে সময়ক্ষেপ রসময়ের ধাতে সইত না)

১৫ই ভাদ্র—

গানের মাস্টারদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ এবং জলসা ইত্যাদির ব্যয় — ৫০।৵০

১৬ই ভাদ্র—

গীতলেখার জন্য সেতার খরিদ — ১০২৲

(খুশি হয়ে গেল গীতলেখা। রসময় রসিক ছিলেন নিঃসন্দেহ)

২৯শে ভাদ্র—

সেতার-শিক্ষকের জলযোগাদির জন্য মা‌ঃ বড় বউ — ৩।০

ঐ সিগারেট ইত্যাদির জন্য গীতলেখার নিকট জমা রাখা যায় — ৫৲

৩০শে ভাদ্র—

সুরঞ্জনের পিতার কাছে যাওয়ার বাসভাড়া — ℴ/১০

টিঞ্চার আইডিন, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি — ৸৵০

ফিরিবার ট্যাক্সি — ৩৲

(বিয়ের প্রস্তাব করতে গিয়ে এই দুর্গতি? কি সর্বনাশ!)

২রা কার্তিক—

সুরঞ্জন ও গীতলেখার পরিণয়ে রেজিস্ট্রেশন ফী ও অন্যান্য বাবদ — ৩৩।ℴ/০

(শেষরক্ষা হয়েছে, তবু ভাল)

৩রা কার্তিক—

খেঁদির প্রাইভেট মাস্টারের জন্য বিজ্ঞাপন — ৪৲

খেঁদির জুতা, সাবান, পাউডার, স্নো ইত্যাদি সেলট্যাক্স সহ — ১৮।ℴ/১০

বই-খাতা — ১২৸/০

১৭ই অগ্রহায়ণ—

মাস্টারের নভেম্বরের মাহিনা	২৫৲
মঞ্জুশ্রী ও মাস্টারের সিনেমার টিকিট	২॥০
ঐ বাবদ ট্যাক্সিভাড়া ও অন্যান্য	৩॥৵০

১৯শে পৌষ—

মাস্টারের ডিসেম্বরের মাহিনা	২৫৲
এক পাউণ্ড চা	২॥০
বিস্কুট এক টিন	৩৸৵০
মাখন ১ কৌটা	৪৲
ময়দা ⁄২॥	২॥০
জানুয়ারি মাসে মাস্টারের মিষ্টান্ন ইত্যাদির দরুণ বড়বউর কাছে জমা রাখা যায়	১৫৲

২২শে মাঘ—

মাস্টারের জানুয়ারির মাহিনা	২৬৲

২০শে ফাল্গুন—

মাস্টারের ফেব্রুয়ারির মাহিনা	২৫৲

৩০শে কার্তিক—

মার্চ হইতে আগস্ট পর্যন্ত মাস্টারের মাহিনা সমেত সুদ-খরচা শোধ মাঃ মাস্টারের পিতৃদেব শ্রীনকুলচন্দ্র ধাড়া	২২৭৲

(মোট আট মাসের মাইনে নিয়ে নিল গালে চড় মেরে !—উঃ !)

৩রা অগ্রহায়ণ—

খেঁদির পাকা-দেখার খরচ	২৩।৶০
বরপণ মাঃ শ্রীনকুলচন্দ্র ধাড়া	৩০০১৲

(আর মঞ্জুশ্রী নয়—পুনশ্চ খেঁদি)

৭ই অগ্রহায়ণ—

বাড়ি-বন্ধকের দলিল সম্পাদনের খরচ : মোট ৩৩৫৷৷০

২১শে অগ্রহায়ণ—

খেঁদির বিবাহের গহনার মূল্য শোধ নাঃ শ্রীঋষিভূষণ মালাকার ১৭১০৮৲

শ্রীমতী খেঁদির বিয়ের তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ। রসময়বাবু ঐ রাত্রেই দেহত্যাগ করেন। বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচপত্র জমাখরচে তিনি লিখে যেতে পারেন নি।

নমিতা রায়

প্রভাস ও নিশি এক সঙ্গে এল। সকলে হৈ-হৈ করে উঠে।

ক'টা বাজে? দেরি হয়ে গেছে সত্যি। নমিতার সঙ্গে দেখা হল অনেক কাল পরে—

নমিতা অর্থাৎ—

নিশি মৃদু হেসে বলে, সে-ই। নমিতা রায়।

প্রভাস বলে, বিয়ের নেমন্তন্নে কি দেওয়া যায় বল তো?

বসতে যাচ্ছিল ফরাসে। সহসা মনে পড়ল, দুলজোড়া পকেটে ঘুরছে বিকেল থেকে। ওটা উপরে পৌঁছে দিয়ে আসা উচিত। উপর-ওয়ালা খুশি থাকবে—আড্ডা ভাঙতে

রাত্রি হয়ে গেলেও আজকের দিনটা তার জন্য অপরাধ হবে না।

আসছি ভাই কাপড়-চোপড় বদলে। চা দিয়ে গেছে তো?

তখন মজাদার প্রসঙ্গ পাওয়া গেছে। কেউ আর উচ্চবাচ্য করল না।

বিয়ের নেমন্তন্নের কথা বলল—কার বিয়ে?

নমিতার ছেলেমেয়ের হবে—

ছেলে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেল?

অরবিন্দ কর গুণে হিসাব করছে, ষোল কিম্বা বড় জোর সতেরো; ষোল বছুরে ছেলের বিয়ে? হতে পারে না।

তা হলে মেয়ে—

অত ছোট মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন? নিজে তো বিষম প্রগতিশীলা—

ওরাই তো বেশি কড়া ঘরোয়া ব্যাপারে। নিজে যা করে বেড়িয়েছে, ছেলেমেয়েরা না করতে পারে।

কলকাতায় এসেছে তবে নমিতা?

কলকাতা ছেড়ে কোথা যাবে?

কুমার বাহাদুর থাকেন তো হীরাগড়ে। কালে-ভদ্রে কলকাতায় আসেন।

কুমারের সঙ্গে সে বিয়ে হয় নি তো! চোখ ট্যারা বলে নমিতা-ই বাতিল করে দিয়েছিল।

বলো কি! কোন্ ভাগ্যবান গেঁথেছে তবে নমিতা রায়কে?··· তুমি জানো সুবোধ?

বিশেষ করে সুবোধকে জিজ্ঞাসার হেতু আছে। সে-ও উমেদার ছিল। চকিতে পুরাণো স্মৃতি ভেসে এল সুবোধের মনে···

সকাতরে নমিতার মুখ চেয়ে সে বলেছিল, একটা লিফট পেয়েছি অফিসে—

ভ্রূকুঞ্চিত করে নমিতা প্রশ্ন করে, কত দাঁড়াল ?

এক শ' পঁচাত্তর—

ওতে ডাল-ভাত হতে পারে। গাড়ি রাখা চলবে না। গাড়ি চাই যে আমার—

বলে গ্রীবাভঙ্গি করে নমিতা চলে গিয়েছিল।

সুবোধ বলতে পার, নমিতার কোথায় বিয়ে হয়েছে ?

নিশি কাগজ পড়ছিল। সে-ই জবাব দিল। মুখ তুলে বলে, মোড়ে ঐ যে মার্বেল-বাঁধানো নূতন বাড়ি হয়েছে—

বলো কি হে! ব্যারিষ্টার পি. এম. ধরের বাড়ি—

নিশি বলে, নমিতার সঙ্গে কথা বলে প্রভাস গেট দিয়ে বেরুচ্ছে, সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা। পাড়ার মধ্যে বাড়ি করেছে, পড়শি হল এবার নমিতা।

অরবিন্দ বলে, মেয়েটা ঘড়েল ছিল—জানতাম. ভাল বিয়ে হবে। তা একেবারে ধরের সঙ্গে!

তাসের প্যাকেট নিয়ে প্রভাস এসে ফরাসের প্রান্তে বসল। তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলে, কি উপহার দিই বলো তো ?

নিশি বলে, যা-তা দেওয়া চলবে না। পি. এম. ধরের মেয়ে—

কার মেয়ে বললে?

নিশি সংশোধন করে বলে, আমরা নমিতাকে চিনি। বলা উচিত অবশ্য নমিতার মেয়ে—

প্রভাস বলে, বিয়ে নমিতার—

সবাই হতবাক্ হয়ে প্রভাসের দিকে তাকাল।

পি. এম. ধরের বাড়ি থাকে। তাঁর মেয়ের গার্জেন-টিউটর। বিয়ে হচ্ছে আমাদের কালাচাঁদের সঙ্গে। কালাচাঁদ আবার ধরের ওখানে চাকরি করে কিনা! কুড়ি টাকা নমিতা ধার চেয়েছে—কি কি কিনবে। এ ছাড়াও ভাবছি, একটা ভাল জিনিষ উপহার দেবো। হাজার হোক, সেই নমিতা তো!

এবং আরও আশ্চর্য ব্যাপার—নমিতা সেই সময় ঢুকল।

টাকাটা এখন চাই প্রভাস। সময় পাই নে তো! একটুখানি ফাঁক পেয়েছি—দোকানে বেরুব।

অপরূপ সুন্দরী ছিল—কিন্তু সে দেড় যুগ আগেকার কথা। মুখে এখন ভাঁজ পড়ে গেছে, শিরা ভেসে উঠেছে, চোখের কোণে কালি। রংটা ফর্শা হওয়ার দরুন উৎকট দেখাচ্ছে, কালো হলে এমনটা হত না বোধ করি। কেন যে বিয়ে করে নি বয়সকালে!

প্রভাস টাকা আনতে উপরে গেল।

কালাচাঁদ ড্রাইভারকে বিয়ে করছ নাকি নমিতা?

মজুমদার ওঁর পদবি। কালাচাঁদ মজুমদার বলো।

হীরাগড়ের কুমার নাকানি-চোবানি খেয়ে গেল—

নিশি টিপ্পনী কাটে, তার মতন চোখ ট্যারা নয় তো কালাচাঁদের—

তবে খুঁড়িয়ে হাঁটে—

নমিতা বলে, ঘোরেন গাড়িতে গাড়িতে। হাঁটেন না।

সুবোধ এতক্ষণে কথা বলল, ভাল হয়েছে। ড্রাইভারের জোগাড় হল—গাড়ির আধাআধি হয়ে গেল তা হলে।

প্রভাস টাকা এনে দিতে নমিতা ঘাড় ফিরিয়ে সেকালের উদ্ধত ভঙ্গিতে চলে গেল। দৃষ্টি তুলে তাকাল না কারও দিকে।

চাঁদের আলো

আশ্চর্য চিকিৎসা গুরুচরণের। আর কেউ না হোক, সুনন্দা জোর গলায় সাক্ষি দেবে। ইস্কুল ফিরতি এক সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরছিল। বিষম দাঁতের যন্ত্রণা—মাড়ি ফুলে উঠেছে, দপদপ করছে কপালের শিরা।

সামনে ডাক্তারখানা দেখে ঢুকে পড়ল। ওষুধে না পেরে ওঠে তো খানিকটা বিষ দেয় যেন ডাক্তার—তাতে নির্ঘাত সর্ব যন্ত্রণার অবসান। কিন্তু ঢুকে সে মুষড়ে গেল—হোমিওপ্যাথি, বিষ থাকে না এখানে। লোকে বলে, আলমারি সুদ্ধ সাবাড় করলেও একটা হেঁচকি উঠবে না।

যাই হোক, গুরুচরণ আদ্যোপান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে হাঁ

করিয়ে মাড়ি দেখে বইয়ের সঙ্গে যাবতীয় লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে—বিষ নয়, ওষধই দিল। ফল প্রত্যক্ষ—আগুনে যেন জল পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কিচ্ছু আর নেই। কেবল ঐ যে গালে হাত দিয়ে হাঁ করিয়েছিল, ঐখানটায় কি যেন একটু লেপটে রয়েছে—এই রকম মনে হয়।

হোমিওপ্যাথির এ হেন শক্তিতে সুনন্দা অবাক। পরের সন্ধ্যায় ডাক্তারকে সে ধন্যবাদ দিতে এল। এমন ডাক্তার—অথচ কি আশ্চর্য, একটা রোগি নেই। কম্পাউণ্ডার অধর সরকার আলমারি ঠেস দিয়ে টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আর গুরুচরণ গলায় আচ্ছা করে কম্ফর্টার জড়িয়ে বিড়-বিড় করে বাংলা মেটেরিয়া-মেডিকা পড়ছে।

নমস্কার নিন ডাক্তার বাবু। কি যে উপকার পেয়েছি, ভাষায় বলতে পারি নে।

হাল ছাড়ে নি তা বলে। সুপ্রচুর ভাষা সংযোগে বহুক্ষণ বলাবলি চলল। লাজুক মানুষ গুরুচরণ—মুখ রাঙা করে ক্রমাগত না-না—করছে। সামান্য একটা ব্যাপারের জন্য বিদ্যাবতী ইস্কুলের মিস্ট্রেস এমন করে বলছেন, লজ্জায় সে কোথায় মুখ ঢাকবে ভেবে পায় না।

এই এক দিনেই যে চুকে গেল, তা নয়। কৃতজ্ঞ সুনন্দা প্রায়ই আসেন। এবং শেষটা হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়লেন। বিদ্যে অনেক শিখেছেন বটে, কিন্তু এই তাজ্জব জিনিষ—যাতে মানুষ কেটে জোড়া দেওয়া যায়—না শিখলে জীবনই বৃথা!

কম্পাউণ্ডার যথারীতি ঘুমোয়, আর এরা নিবিষ্ট হয়ে হোমিও-প্যাথি চর্চা করে।

হোমিওপ্যাথির ফাঁকে ফাঁকে গুরুচরণের বাড়িঘরেরও খবরা-খবর নেয়।

কে আছে আপনার?

কুঁড়ের রাজা ঐ অধর সরকার—আবার কে? মাইনে নেয় না, ঘুমানো ছাড়া কিছু চায় না আর জীবনে—তাই রয়ে গেছে। পশার জমলে ওকে তাড়িয়ে ভাল কম্পাউণ্ডার রাখব।

তার অবশ্য সুদূর-সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। পাড়াটা যাচ্ছেতাই। শহরতলী জায়গা তো—আটটা না বাজতে চারিদিক, দেখ, একেবারে নিশুতি। দিনমানেই এ রাস্তায় যে ক'টা লোক চলাচল করে আঙুলে গণে নেওয়া যায়।

গুরুচরণ মনে করিয়ে দেয়, ঘড়ি খারাপ আছে বোধহয় আপনার। আটটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

হোক গে। বাড়ির লোকে জানে, নতুন ট্যুইশানি নিয়েছি—হেড মিস্ট্রেসের ছেলেকে পড়াচ্ছি। তা পড়াতে পড়াতে একটু যদি রাত হয়ে যায়—কি করা যাবে? ছেলেটা এক নম্বরের গাধা কি না—বোঝে কম।

গুরুচরণ সকাতরে বলে, খোলা যায়গায় বেশি রাত্তির এমনি ভাবে বসা ঠিক নয় কিন্তু। সর্দি লেগে যেতে পারে।

তবু সুনন্দা কানে নেয় না। অবস্থা উত্তরোত্তর আরও ঘনীভূত হল। একদিন সুনন্দা প্রস্তাব করে, কি এক জায়গায়

বসে বসে ল্যাজ নাড়েন! চলুন, রেল-রাস্তার দিকে বেড়ানো যাক—

গুরুচরণ শিউরে ওঠে। ওরে বাপ রে! গলার কম্ফর্টার আরও এঁটে দেয়।

সুনন্দা বলে, বোশেখের এই গরমে মানুষে আইঢাই করছে— আপনি এক বোঝা জড়িয়ে আছেন কি করে?

বেঁচে আছি এরই জন্যে। ক-দিন মেঘ মেঘ করছে—বাতাস ম্যাজমেজে হয়ে আছে। ভয় তো এই সময়। গরমের পর ঠাণ্ডা লেগে চট করে নিউমোনিয়া ধরে যায়।

কোনক্রমে তাকে বের করা গেল না

সুনন্দা বলে, একা একা পড়ে থাক—সত্যি বড় কষ্ট তোমার।

একা কিসে? অধর সরকার আছে, আর মেটেরিয়া-মেডিকা রয়েছে। ভালই কেটে যায় এক রকম।

হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়—পুরুষমানুষের এ সমস্ত পোষায়?

গুরুচরণ বলে, ভাতে ভাত। চাল-ডাল তরকারিপত্তোর একসঙ্গে কুকারে চড়িয়ে দিই। দিয়ে বই নিয়ে বসি। হাতে আগুনের আঁচটুকুও লাগে না।

আচ্ছা, আমি রেঁধে দেবো একদিন। কালই বরঞ্চ। কিনে কেটে রাখবেন, আমি ফর্দ করে দিয়ে যাচ্ছি।

ভেবে ভেবে একটু ভারী রকমের ফর্দ করল সুনন্দা।

পরদিন ইস্কুল থেকে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে বেশ বেলা থাকতেই এসেছে।

কই?

ফর্দটাই পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় কারো ওষুধ মুড়ে দিয়েছে কিম্বা অধর ঝেঁটিয়ে ফেলেছে।

সুনন্দা বলে, তোমায় দিয়ে হবে না। আচ্ছা, নিজে আমি বাজার করাব ইস্কুলের বেয়ারাকে দিয়ে। গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে দিও আজকে।

গুরুচরণ শিউরে ওঠে—পঞ্চ মুদ্রার বাজার একদিনে একসঙ্গে! কিন্তু বলতে ভরসা হয় না। বলবার ফাঁকও নেই। গল্প—গল্প! সুনন্দার বিয়ের সম্বন্ধ রোজ নাকি দুটো চারটে করে আসছেই। উকিল, জজ, জমিদার-তনয়···কিন্তু ডাক্তার ছাড়া সে বিয়ে করবে না। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে অহরহ খিটিমিটি—

টং-টং করে কাদের ঘড়িতে দশটা বাজল। খেয়াল করে নি—আরে সর্বনাশ! হন-হন করে ছুটল। মা আজ আস্ত রাখবে না।

ইস্কুলে গিয়ে মনে পড়ে, টাকাটা কাল নিয়ে আসা হয় নি তো! কেরানি বাবুর কাছ থেকে ধার নিয়ে সে বাজার করতে পাঠাল।

সমারোহে রাঁধাবাড়া হল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া। আজ সুনন্দা ভোলে নি—যাওয়ার সময় বলল, চার টাকা সাত আনা খরচ হয়েছে। দিয়ে দাও।

গুরুচরণ জিভ কেটে বলে, ইস—আগে বললে না কেন? অধর আলমারি বন্ধ করে চলে গেল! আলমারির মধ্যে ক্যাস বাক্স—

যাকগে, কাল নিয়ে নেব। অমন করছ কেন, লজ্জা পাবার কি আছে এতে?

পরদিন ভারি দুর্যোগ। ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় জল জমেছে। আকাশে মেঘ আছে এখনো। কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার...এ হেন রাত্রে গুরুচরণ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রেল রাস্তার ধারে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হল। গদ-গদ কণ্ঠে সে বলে, পূর্ণিমা এসে গেল। চাঁদ কত বড় হয়েছে, দেখ—

সুনন্দা বলে, চাঁদ দেখবার দিনই বটে! আজকে তোমার ঠাণ্ডা লাগে না?

গুরুচরণ স-দুঃখে বলে, কি রকম তুমি হয়ে যাচ্ছ, সুনন্দা। জ্যোৎস্না মিষ্টি লাগছে না?

অগত্যা কিছুক্ষণ ধরে জ্যোৎস্না-সেবন এবং মুখে আহা-আহা করতে হয়। কিন্তু মন অস্থির—বড্ড কড়া তাগিদ দিয়েছে ইস্কুলের কেরানি বাবু। বলে, ঘরে চলো—

এখন ঐ কোণের মধ্যে গিয়ে বসা? গুরুচরণ শিউরে উঠল।

বৃষ্টি আসছে। ভিজে টইটম্বুর হতে হবে—খেয়াল আছে?

তা হোক। ভিজলামই না হয় একদিন।

সুনন্দা অবাক হয়ে তাকায়। স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে আর চলল না।

এর পরে তোমার অধর সরকার আলমারির চাবি নিয়ে চলে যাবে। টাকাটা চাই আমার—

কিন্তু নিসর্গ-শোভায় গুরুচরণকে এমন পেয়ে বসেছে, কোন কথা যেন কানে যাচ্ছে না। সুনন্দা উঠে পড়ল।

চললে?

ঝাঁঝের সঙ্গে সুনন্দা বলে, নয় তো কি নিউমোনিয়া হয়ে মারা পড়ব?

কিন্তু রাগ করলেও কাজ ভোলার মানুষ নয়। সোজা সে ডাক্তারখানায় চলে গেল অধরের তল্লাসে। আলমারি খুলিয়ে ক্যাসবাক্স সহ তাকে নিয়ে আসবে রেল-রাস্তায়। চার টাকা সাত আনা শোধ করে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরবে।

ডাক্তারখানায় দস্তুরমতো সোরগোল। জন আস্টেক ভদ্র ব্যক্তি তক্তাপোশ জুড়ে বসেছেন। আজ অধর ঝিমোচ্ছে বারান্দার মোড়ার উপর বসে। সুনন্দা মৃদু পায়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিল।

শোন—

হাত ধরে নামিয়ে আনল সাঁকোর দিকে।

কারা ঐ সব?

ডাক্তার বাবুর বাবা-কাকা-মামারা আছেন। আর ওঁরা এসেছেন তিলসোনার চৌধুরি-বাড়ি থেকে—

এই যে বলেছিল, তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেউ নেই—এখন পিল-পিল করে বাবা-কাকার দঙ্গল আসে কোত্থেকে?

আবার বলে, কি হচ্ছে ওখানে?

দেনাপাওনা সাবস্ত হচ্ছে। ডাক্তার বাবুর বিয়ে যে তিল-সোনায়। কুটুম্বদের ঘর ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন বাইরে বাইরে ঘুরছেন।

সুনন্দা স্তব্ধ হয়ে গেল। থালার মতো চাঁদ মেঘে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। অদূরে ঘরের মধ্যে হেরিকেনের ম্লান আলোয় কুটুম্বর দল হিসাবপত্র নিয়ে মহাব্যস্ত। সুনন্দা একটা ঢোঁক গিলে বলে ক্যাসবাক্সটা নিয়ে চল দিকি ডাক্তার বাবুর কাছে—

বুড়ো আঙুল নেড়ে অধর বলে, বাক্স নিয়ে গিয়ে কি হবে? ভিতর ঢনঢন। রুগি আজ এক মাসের মধ্যে এ-মুখো হয় নি—ঐ যা সেদিন আপনি এসেছিলেন। তা টাকা আপনার মারা যাবে না দিদিমণি, পেয়ে যাবেন। নগদ পণও দিচ্ছে চৌধুরিরা—চার-পাঁচ টাকা হয়ে যাবে তার ভিতর থেকে।

ভগবানের বিপদ

ভগবান মুশকিলে পড়েছেন। সোয়াস্তি নেই—মানুষজন অতিষ্ঠ করে তুলেছে চেঁচামেচিতে।

যমকে বললেন, তুমি অকর্মণ্য—

আজ্ঞে, খুবই চেষ্টা করিছি। নতুন নতুন রোগ বেরুচ্ছে, রোগ পাছে আরোগ্য হয়ে যায় সেই ভয়ে দলে দলে ডাক্তার। মরছেও অঢেল। তবু কমে না।

ভগবান উপদেশ দিলেন, বাচ্চা থেকেই নিকেশ করতে থাক। বুদ্ধি না পাকতে, কথা না ফুটতে।

শিশু-মড়ক লেগে গেল। আরো পূজার ঘটা। ঢাকের বাজনায় জন্তু-জানোয়ার গভীর জঙ্গলে পালাল। ধূপ-ধূনোয় আকাশ অন্ধকার। বলছে, ভগবানের দয়া। ছোটদের তিনি বড় ভালবাসেন, আদর করে তাই পদতলে টেনে নিচ্ছেন।

কি সর্বনাশ! বুঝলাম, যমকে দিয়ে হবে না। ব্যাটাদের জ্যান্ত রেখে রেখে মারতে হবে।

বরুণকে ইসারা করলেন। বৃষ্টির জলে টইটম্বুর। নদীতে বান ডেকেছে।

কি বলে এবার?

বলছে, তাদেরই পাপের ফল এই সমস্ত। পাপ-খণ্ডনের জন্য আরও জোর পূজোর জোগাড় করছে।

ভগবান শিউরে উঠলেন।

আচ্ছা সবাই এই বলে? উল্টো কথা বলছে না কেউ?

আজ্ঞে, বলে দু-পাঁচ জন। শঠ-ফেরেববাজ তারা—ভাল লোক নয়।

ভেবে চিন্তে ভগবান কুবেরকে বললেন, টাকা ঢেলে দাও ঐ সব বদলোকের সিন্ধুকে।

খলখলিয়ে হাসেন। এবারে ভালো বুদ্ধি হয়েছে—খারাপ লোকের উন্নতি দেখে ভগবদ্ভক্তি দূর হবে। পূজার সোরগোল কমে যাবে।

লাখপতি কোটিপতি হয়ে গেল পৃথিবীর যাবতীয় চোর জুয়াচোর কালোবাজারি মানুষ।

কি বলে এখন লোকে?

পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল, এবারে তাই এত ঐশ্বর্য। এদের পুণ্যের ফল ফলবে আগামী জন্মে। না খেয়ে না পরে তাই মন্দির বানাচ্ছে।

ওঃ!

কপালের ঘাম মুছে ভগবান সফরে বেরুলেন। ত্রিভুবন ঘুরে এলেন অলক্ষ্য ভাবে। এসে অনন্ত-শয্যায় শুয়ে পড়লেন।

আসবার সময় কিছু কাপাস-তুলো জোগাড় করে এনে

ছিলেন। তূলো কানে দিয়ে পড়ে আছেন। লোকের চিৎকারে আর তিনি বিচলিত হন না।

ধর্মঘট

সকালে উঠেই ভোম্বল রাহুত ম্যানেজারের ঘরে গেল।

ফিষ্টি হচ্ছে তো আজকে রবিবারে? কি কি করবেন? মাংস, দই, মাছ···আর রাবড়িও চাই কিন্তু। আমার চার জন গেস্ট।

বলে চার দুনো আট টাকা অগ্রিম দিয়ে গুণ-গুণ করে গান ভাঁজতে ভাঁজতে সে বেরুল।

লড়াই ফতে। স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। রবিবারে পুরো দিনটা আজ ছুটি। মাইনে পাবে ছুটির দিনের। প্রথম এই পুরো মাইনের ছুটি।

কম লড়তে হয়েছে এর জন্যে? মোটর-ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়া হল তো পাশাপাশি আর একটা মোটর-মেনস ইউনিয়ন। দু-দলে চলল লাঠালাঠি। অনেক চেষ্টায় অবশেষে বিরোধ মিটল—শহরের সমস্ত ড্রাইভার একত্র হল এক ইউনিয়নে।

সপ্তাহে একটা দিন অন্তত ছুটি চাই—এই ছিল একটা দাবি। হুজুররা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন—অন্যায় আবদার। রবিবারটা

অফিস-এলাকার বাইরে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি, এই ছোট্ট একটু সুখেও বাদ সাধতে চায়।

অতএব ধর্মঘট। দু-সপ্তাহ শহরে প্রাইভেট গাড়ি চলে নি। হুজুরদের ভিতর নিজেরা অনেকে গাড়ি চালাতে জানেন, লাইসেন্সও আছে। কিন্তু সাহস করেন না। কি জানি, কোন গলিঘুঁজিতে ঘাপটি মেরে আছে—ঢিল মেরে মোটর ভাঙবে। মাথাও ভাঙতে পারে। অবশ্য মাথার চেয়ে মোটরের দাম অনেক বেশি।

কাজেই তাঁরা হেঁটে হেঁটে যথাসাধ্য অফিস করলেন; যাদের সঙ্গে একশ' হাত ব্যবধান রেখে যাতায়াতের অভ্যাস, বাসের সিটে পাশে বসে তাদের কৃতকৃতার্থও করলেন দায়ে পড়ে। অবশেষে নরম হলেন। হোকগে তাই—শুনবে না যখন ঘরের মধ্যে শুয়ে বসেই রবিবার কাটানো যাবে।

তারপরে প্রথম রবিবার আজ। ভোম্বল ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অপরূপ আনন্দ-স্বাদে তার মন-প্রাণ ভরে উঠেছে। ব্রজেনবাবুর প্রতি তারা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, ভাল উকিল, নিরহঙ্কার অমায়িক ভদ্রলোক। দু-দুখানা গাড়ির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ড্রাইভারের দুঃখ বোঝেন।

ব্রজেনবাবু পরশু বলছিলেন, লড়াই জিতিয়ে দিলাম—খাওয়াতে হবে ভোম্বল। কবে তোমার মেসে যাব, বলে দাও—

তিনি ব..তে পারেন একথা। দু-মুখো লড়াই। লড়তে
য়েছে দলের লোকের সঙ্গে, তাদের ভয় ভাঙাতে হয়েছে
াকরি যাবে না—তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক পাবে কোথায়?
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোন লোক কাজ নিতে যাবে না। বোঝ
না, অত টাকার গাড়ি বসিয়ে রেখে বাবুরা কি কলকব্জায়
মরচে ধরাবে? মিটমাট হয়ে যাবে, সবুর করো ক'টা দিন—

আবার মোটরের মালিক ব্রজেনবাবুর বন্ধু-বান্ধবরা এসে পড়লেন তাঁর কাছে।

তুমি ওদের মধ্যে ভিড়লে কেন? বেরিয়ে চলে এসো—তারপর ক'দিন ইউনিয়ন টেঁকে দেখা যাবে।

অনুরোধ-উপরোধ টলাতে পারে নি ব্রজেন বাবুকে। বান্ধবরা তখন রটাতে লাগলেন, ইলেকসানে দাঁড়াবার মতলব। দেখা যাবে, ড্রাইভারের ক'টা ভোট আর আমাদের কতগুলো।

কুৎসা শুনে ব্রজেনবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, উজবুক!

ম্যানেজারকে টাকা দিয়ে ভোম্বল ব্রজেনবাবু ও আর তিনটি সহকর্মীকে নিমন্ত্রণ করতে ছুটল। কাজ চুকিয়ে তারপর ইউনিয়নের অফিসে এসে বসেছে। কত লোক আসছে যাচ্ছে—অভিনন্দন জানাচ্ছে। উল্লাসের অবধি নেই।

ইতিমধ্যে স্নানাদি সেরে ব্রজেনবাবু এসে উপস্থিত।

এ কি ভোম্বল, এখনো এখানে বসে?

হাত উঁচু করে দেখালেন। হাত-ঘড়িতে পৌনে-বারো। ভোম্বল অবাক হল। এরই মধ্যে ?

বলে, যাকগে। ম্যানেজার পাকাপোক্ত লোক—সব ঠিক হয়ে আছে। চলুন তা হলে—

আর যে তিন জন—তারা বলে, দু-মিনিট বসুন ব্রজেনবাবু। চান করে নিচ্ছি। তুমিও একটু বোসো ভোম্বল-ভাই।

সকলে এক সঙ্গে চলল। ঠাঁই করে এদের বসাতে বসাতে ভোম্বল সেই ফাঁকে চৌবাচ্চা থেকে দু-চার মগ মাথায় ঢেলে নেবে।

কিন্তু মেসে এসে দেখল, কেমন নিঝুম ভাব যেন।

ম্যানেজার !

ঠাকুর বেরিয়ে এসে বলল, তিনি নেই—

খাওয়ার পাট এরই মধ্যে চুকে গেছে ? থাক গে। এই বাবু চার জনের আর আমার জায়গা তাড়াতাড়ি করে দাও। মাছের মুড়ো দেবে ব্রজেন বাবুকে, ম্যানেজারকে বলা আছে।

ঠাকুর বলে, রান্না হয় নি বাবু—

সে কি ?

আমাদের ধর্মঘট আজকে—

ভোম্বল ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এঁদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলাম, আমার মান-ইজ্জত যায়—বেছে বেছে তোমরা ধর্মঘটের আর দিন পেলে না ?

আমি কি করব বাবু? আপনারা জিতলেন—আমাদের ইউনিয়ন বলে, রসুই-বামুনরাই বা রোজ আগুনের তাতে পুড়বে কেন? রবিবারে আমাদেরও কাজ বন্ধ।

ক্ষুধায় অবসন্ন ব্রজেনবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, উজবুক!

শহীদ

মোকামা-ঘাটে নামলাম রাত্রি সাড়ে-দশটায়। ওপারে গিয়ে ছোট-গাড়িতে চাপতে হবে। স্টিমার ঘাটেই অপেক্ষা করে—কিন্তু আজকে কি বিভ্রাট ঘটেছে, এখনো এসে পৌঁছায় নি।

কুলিদের জিজ্ঞাসা করি, স্টেশনের এক বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—স‌িক কেউ বলতে পারে না। থামের গায়ে ঠেশ দিয়ে হোল্ড-অলটার উপর চেপে বসলাম তখন। জিরিয়ে নেওয়া যাক, ট্রেনে বড্ড ধকল গেছে।

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ আকাশে হাসছে। জোয়ারের গঙ্গা ঝিকমিক করছে অদূরে উচ্ছল জলস্রোতে। স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ায় চোখ বুজে আসে। এলোমেলো নানা ভাবনা তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যায়।

ভাঙা-কাঁসরের মতো গলায় কে বলল, দুটো পয়সা দেবেন?

চমকে চোখ মেললাম। সাধারণ ভিখারি নয়। এক ভদ্রলোক—চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু মানুষের গলায় এমন খ্যানখেনে আওয়াজ বেরোয়, স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস হত না।

কে আপনি ?

মানুষ ছিলাম এক সময়ে—

কথাবার্তার ধরনে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছি। কুলির দল অনেক দূরে গুলতানি করছে। লোকজন সমস্ত ও-ধারে। এদিকটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

বাড়ি কোথায় আপনার ?

ছিল রংপুরে। এখন কোন খানে নেই। বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি।

কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি—

নামটা বলুন দিকি।

শ্রীপ্রফুল্ল—

প্রফুল্ল চাকি ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আজ্ঞে না, প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বুঝতে পেরেছি, কার কথা বলছেন। ঘুমুচ্ছিলেন—বলি, স্বপ্ন দেখছেন এখনো ? প্রফুল্ল চাকি হল বিশ বছরের ছেলে, ইস্পাতের মতো দেহ, এক-মুখ হাসি—হাসতে হাসতে নিজের মাথায় আর বুকে গুলি করল এই যেখানটায় আপনি বসে বসে ঘুমুচ্ছেন।

জায়গাটা তাকিয়ে দেখে নিলাম ভাল করে।

ভদ্রলোক বলেন, ছুটো পয়সা দিন স্যর। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—দাঁড়াতে পারছি নে। এক কাপ চা খেয়ে আসি।

চা পাবেন দু-পয়সায় ?

তা হলে চারটেই দিন। একসঙ্গে অত চাইতে ভরসায় কুলোয় না। তা আপনি ভাল লোক—পুরোপুরি এক কাপেরই দাম দিয়ে দিন।

সঙ্গে খাবার ছিল—কতকটা দিলাম কলাপাতায় করে। গোগ্রাসে গিলছেন। কত যে ক্ষুধার্ত, খাওয়ার ধরন দেখে বুঝতে পারছি। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে উৎকট হাসি হাসতে লাগলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুনে আবার হয়তো, স্যর, ধরে বসেছেন আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। দশা অবশ্য আমাদের একই।

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করি, কি বলছেন—আচার্য রায় আর আপনার দশা এক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর দাড়ি ছিল, আমারও এই দেখুন। তিনি ভারতবাসী নন, বিদেশি—পাকিস্তানি ; আমিও তাই। তবে বলতে পারেন, ত্রিকালদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি—ক-বছর আগে মরে বেঁচে গেছেন। আমি অদ্দূর বুঝব কেমন করে ?

খাওয়া শেষ করে পুরো এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে প্রফুল্ল রায় বললেন, সিগারেট আছে ? থাকে তো একটা দিন—দেশের কাজ করি।

সিগারেট বের করে দিলাম।

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে দেশের কাজের কি সম্বন্ধ, বুঝতে পারছি না তো ?

বিদেশি জিনিষ পুড়িয়ে ফেলেছি। স্বদেশি আমলে এ সব কত করেছি ! ঐ যে প্রফুল্ল চাকির কথা হচ্ছিল—সহপাঠি আমরা দু-জনে। ঝুড়ি ঝুড়ি বিলাতি মাল আমি পুড়িয়েছি, সে-ও পুড়িয়েছে।

দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে পরমাগ্রহে বলি, বলুন একটু প্রফুল্ল চাকির কথা। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু তো জানা যায় না !

ভারি চালাক। ঐ যে বলছিলাম ত্রিকালদর্শী—ওঁরা সত্যিই তাই। মামলায় খালাসও তো পেয়ে যায় অনেকে—রিভলভার দিয়ে তাই পথ কেমন সংক্ষেপ করে নিল ! নইলে চিরকাল ধরে সেই বিশ বছরের ছেলেটি হয়ে থাকতে পারত কি ? বেঁচে থাকলে বুড়ো-থুত্থুড়ে আমারই মতো সর্বস্ব খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে প্লাটফরমে ভিক্ষে করে বেড়াত।

ছি-ছি, ও-সব বলবেন না। ভাবাও পারা যায় না অমন কথা। বাংলার প্রথম শহীদ হলেন তিনি—

উদ্দেশ্যে নমস্কার করলাম। প্রফুল্ল রায়ও থতমত খেয়ে চুপ করলেন।

তারপর মৃদু কণ্ঠে কতকটা আত্মগত ভাবই বলতে লাগলেন, চালাক বলছিলাম এই জন্যেই তো ! দু-হাত জোড়া নমস্কার

আদায় করে নিচ্ছে, আর আমি পেটের দায়ে দুটো পয়সা চাইলে রাস্তার লোকেও দশ কথা শুনিয়ে দেয়। অথচ দু'জনে বন্ধু আমরা—এক মাঠে খেলেছি, একসঙ্গে ভলন্টিয়ারি করেছি—

জল-তাড়নার আওয়াজ পাচ্ছি। সার্চলাইট দেখা গেল। স্টিমার আসছে। আমার কুলিটা ছুটে এসে মালপত্র মাথায় তুলল।

দিন পনের পরে ভোরবেলা স্টিমার থেকে আবার ঐ মোকামা-ঘাটে নামলাম। স্টেশনের কাছে নিমতলায় জনতা। একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

পুলিশ এসে দড়ি কেটে লাস নামাল। জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়ছে। বীভৎস চেহারা।

সকলে বলাবলি করছে, যাক—বেঁচে গেল। হবে না মাথা খারাপ? কি কষ্টটা পেল এই বয়সে!

ভাল করে চেয়ে দেখি। রাত্রিবেলা অন্ধকারে দেখা—চিনে উঠতে পারি নে। পুলিশ এমনি সময় তার শতচ্ছিন্ন জামার পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে পড়তে লাগল—

পশ্চিম-বাংলার প্রথম শহীদ আমি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এতদ্দ্বারা জানাইতেছি···

শাঁখিনী

মেয়ে-কামরায় উঠে খুনখুনে এক বুড়ি প্রশ্ন করলেন, দত্তপুকুরে তোমরা কেউ নামবে বাছা ?

একটি-দু'টি নয়—দশ-বারো জন নানা দিক দিয়ে সাড়া দিল। বুড়ি একটা জায়গা নিয়ে বসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ—বাঁচলাম। ভয় হয়েছিল, বুঝি বা একলাই আমাকে নামতে হয় ! হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে যা কাণ্ড চলেছে—মেয়েমানুষের পথে বেরুনো দায়। তা অনেকেই নামছ তো তোমরা—বিস্তর বলভরসা !

কমবয়সি এক মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, দত্তপুকুর পৌঁছবে কখন ?

মেয়েটি বলল, কেউ তা বলতে পারবে না দিদিমা। গার্ড-ড্রাইভারেও নয়। বনগাঁ আর বেনাপোলে হয়তো বা আটকে রাখবে পাঁচ ঘণ্টা দশ ঘণ্টা। সবই ওদের মরজি।

তবু ?

এইটুকু বলা যেতে পারে, সন্ধ্যের পরে আর সকালের আগে কোন এক সময় পৌঁছবে।

বুড়ি সভয়ে বললেন, আরে সর্বনাশ ! তবে আমার উপায়

কি ? জানাপোলের দিকে কেউ যাবে তোমরা বাছা ? তা হলে সাথে-সঙ্গে যেতে পারি। নয় তো পড়ে থাকব স্টেশনে। মশা যা এক-একটা—এক কাচ্চা করে রক্ত টানে। তা সে মশায় খাক আর বাঘেই টেনে নিক, রাত্তিরবেলা পাকা-পোতা ছেড়ে নড়ছি নে। অত সাহস নেই বাছা। উঃ, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে যা মুশকিল মানুষের!

ভাগ্যক্রমে জানাপোলের যাত্রীও পাওয়া গেল। দু'টি মেয়ে—আর পুরুষ-গাড়িতে আছে তাদের সঙ্গী চার জন জোয়ান-পুরুষ ও এক ইস্কুলের ছোঁড়া। অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে বুড়ি ভূতের গল্প শুরু করলেন—

জানাপোলে একবার কি কাণ্ড হল, শোন। অমাবস্যার রাত, আঁধার ঘুটঘুট করছে, আমরা গরিব-কালীবাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছি কালীপূজো দেখে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের হাঙ্গামা ছিল না তখন, ইচ্ছেমতো চলাফেরা করি—কথাবার্তায় বেশ শব্দ-সাড়া করে আসছি একটা দল। আমি সকলের আগে। হঠাৎ দেখি, পথের মাঝখানে এই উঁচু এক তালগাছ। এ গাছ আগে ছিল না, থাকতে পারে না। দু-পাশে গরুর গাড়ির চাকার পই পড়েছে—কত কত বোঝাই গাড়ি হাটে যায় এই পথে—সেই দু-পইয়ের মাঝামাঝি তালগাছ থাকে কি করে? যাই হোক, আছি দশ-বারো জন—পাশ কাটিয়ে গেলাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা—ঝাঁকড়া ডালপালা মেলে আবার এক তেঁতুলগাছ পথ আটকে আছেন। পিছনে আর একটা

দল আসছিল—মহাদেব ঠাকুর তার মধ্যে। মহাদেবের বিষম রাগ হয়ে গেল—সে আবার গুণীন লোক কিনা! বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে? সঙ্গে কে যাচ্ছে, হুঁস নেই? রোস্—। বলে ঠাকুর পায়ের চটি না খুলে পটাপট ঘা দিচ্ছে তেঁতুলগাছের গায়ে। আর—কি হল, বল তো? বললে বিশ্বাস করবে না দিদি-ভাইরা—অত বড় গাছ পড়পড় করে মাটি থেকে আকাশে উঠে মিত্তিরদের দোলমঞ্চ পেরিয়ে আমবাগান-বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে···

মেয়ে ক'টি বুড়ির একেবারে কাছ ঘেঁসে বসেছে। একটির দিকে নজর করে তিনি বলে উঠলেন, ভগবতীর মতো চেহারাখানা—এ কি তোমাদের ফ্যাসন হয়েছে আজকাল? ন্যাড়া হাত কেন দিদি? এই শাঁখাজোড়া পরো। আবার নিয়ে নেবো---লজ্জা কিসের—আহা, দেখিই না কেমন মানায়!

বোঁচকা খুলে বৃদ্ধা এক কৌটো বের করলেন। সোনা-বাঁধানো শাঁখা তার ভিতর। অনেক—দশ-বারো জোড়া তো হবেই। চমৎকার শাঁখাগুলো, আর কি মানান করে সোনায় মুড়েছে! চোখে পলক পড়ে না মেয়েদের।

এত শাঁখা নিয়ে যাচ্ছেন কোথা?

জানাপোলে আমার রাবণের সংসার দিদি-ভাই। বেলায় ত্রিশ-চল্লিশখানা পাতা পড়ে। পাঁচ ছেলে, চার বউ। নাতি-নাতনিতে তেরোটি। তিন মেয়ে আছে, তাদের ছেলে-মেয়ে

হয়েছে। মেয়ে-বউ-নাতনি—সকলের শাঁখার ফরমাস। কত-গুলো লাগে, তা হলে হিসেব করে দেখ।

তার পর মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ—কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

হাতখানা তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন বৃদ্ধা।

তুমি এসো তো দিদি। কেমন নিটোল গড়ন তোমার-আহা, লজ্জা কিসের? নিজের নাতনিরা আছে অবিশ্যি—তা বলে তোমরাও ভাই পর নও। সেকেলে মানুষ—অত আপন-পর বুঝি নে। শঙ্খ-হাতের শোভা দেখব, সেই জন্যে বলছি।

একে একে অনেককে পরানো হল।

একটা মেয়ে খুলে রেখে দিতে যাচ্ছে, বুড়ি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

খুলো না দিদি, কি যে মানিয়েছে! গয়না তো কত জনে পরে থাকে, কিন্তু দেখে সুখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, শ্যাওড়ার ডালে মুক্তো ঝুলিয়েছে। তা পরিয়ে একটু তৃপ্তি পাচ্ছি, মনে শান্তি হচ্ছে—এতে বাদ সাধবে কেন?

গদখালি ছাড়িয়ে বর্ডার-স্টেশন বেনাপোলে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। গদখালি জায়গাটার ভূতের জন্য প্রসিদ্ধিও আছে।…ম্যালেরিয়া প্রথম দেখা দিয়েছিল এ-অঞ্চলে, গ্রামকে গ্রাম উজাড় হচ্ছে। জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ি—ইতিমধ্যে সে বাড়ির সবাই ফৌত। জামাই দরজা ঝাঁকাচ্ছে, ঝাঁকিয়েই চলেছে। তারপর ঝমাঝম মল বাজিয়ে বউ এসে দুয়োর খুলল।

জামাই বিষম চটে গেছে।

আমি চলে যাব এখনই—।

এসো, এসো না গো! অত রাগারাগি করে না। দেখ, অসুখ-গায়ে আমি উঠে এসেছি—

গেল কোথা বাড়ির সবাই?

যাত্রা শুনতে গেছে ও-পাড়ায়। তুমি খবর দিয়ে এসো নি তো! জ্বর-জ্বর হয়েছে বলে আমিই কেবল যাই নি।

নির্জন বাড়ির মধ্যে ঢুকে নতুন জামাই খুশি হয়ে ওঠে।

তা ভালোই হয়েছে। তোমায় একটু একা-একা পাব, এই কামনা করছিলাম ভগবানের কাছে।

ভগবানের নামে বউ কেঁপে ওঠে। সে-ও মরে গেছে কিনা, মরে পেত্নী হয়েছে। যা-ই হোক বসল গিয়ে জামাই। বলে, ক্ষিধে পেয়েছে। শরীরের অবস্থা এখন কি রকম—রান্না করতে পারবে?

বউ বলে, খুব—খুব। একটুখানি জ্বর মতো হয়েছে—তা তুমি এসেছ, উপোস করে থাকবে নাকি?

পেত্নী হলেও বউটা বড্ড ভালবাসে স্বামীকে। রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরাল। কিন্তু কাঠকুটো নেই—ইদানীং রাঁধা-বাড়ার গরজ হয় না তো! কি করবে, এই রাত্রে কোথায় এখন কাঠ যোগাড় করে বেড়াবে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেরই একখানা পা উনুনে ঢুকিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। চিতের আগুনে একবার পুড়েছিল কিনা, আগুনে

তার কিছু হয় না। পোড়ে না, জ্বালা করে না, কোন রকম যন্ত্রণা নেই।

শোবার ঘরে জামাই একা চুপচাপ বসে। শেষটা ভাবল, বাড়িতে কেউ যখন নেই—লাজলজ্জার কি আছে? যাওয়া যাক রান্নাঘরে, গল্পগুজব করিগে দু-জনে।

পা টিপে টিপে এসে বউকে চমকে দেবে—ঢুকে পড়ে দেখে এই তাজ্জব!

কাস্টমসে মেয়ে-কর্মচারী রেখেছে—হুড়মুড় করে তারা কামরায় উঠে পড়ল। কীর্তিবাসের রামায়ণে চেড়ির কথা আছে—সেই বর্ণনা মিলিয়ে মিলিয়ে বোধকরি লোক রেখেছে। না দেখা যায় কোথাও এমন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা, না বোঝা যায় তাদের মুখের কিচির-মিচির এক বর্ণ।

মেয়েরা গল্পে মজে আছে, একজন তার মধ্য থেকে ইংরেজিতে বলল, আপত্তিকর জিনিষ কিচ্ছু নেই। আমাদের গল্প মাটি করবেন না—কাজ সেরে চলে যান দিকি তাড়াতাড়ি।

হেসে ফেলে তারাও রীত-রক্ষার মতো দুটো-একটা প্রশ্ন করে নেমে গেল।

গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, এমনি সময় জন তিনেক এসে সেই কামরায় উঠল। কলকণ্ঠে মেয়েরা আহ্বান করে, রাবেয়া, তুই কোত্থেকে রে?

রাবেয়াও উল্লসিত হয়ে বলে, দল বেঁধে চলেছিস—দেশে

এসেছিলি বুঝি আম-কাঁঠাল খেতে? আমি, চাচীআম্মা আর বাড়ির অনেকে এখানে এসেছিলাম এক সাদির ব্যাপারে।

বর্ষীয়সী সহযাত্রিণীকে দেখিয়ে বলে, এই যে—ইনি চাচী আমার। আর এরা হল রেবা আর তপতী। আমরা এক সঙ্গে পড়তাম চাচী, পাকিস্তান হবার পর এরা কলকাতায় পালিয়েছে।

বৃদ্ধা একটু সরে গিয়ে চুপচাপ এদের পরিচয়-পর্ব দেখছিলেন। চাচী সাহেবা হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, চিনতে পারেন?

বৃদ্ধা দৃষ্টি কুঞ্চিত করে বললেন, না তো! চোখে বড্ড কম দেখি।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

চাচী বললেন, মনে পড়ছে না? এই তো পরশু দিনের কথা। ছাপা-শাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়ে-বউ-নাতনিদের জন্য।

আমি? না মা, তোমার ভুল হচ্ছে—

অতক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল, ভুল কেন হবে? যশোরের কাছে ঝুমঝুমপুরে বাড়ি আপনার। মস্ত বড় সংসার—ছয় ছেলে, দুই মেয়ে, পাঁচ বউ। মেয়ে-বউর ফরমায়েসি কাপড় নিয়ে যাচ্ছিলেন। একসঙ্গে অত শাড়ি দেখলে আটক করে ফেলবে—আমাদের সকলের কাছে তাই একখানা করে গছালেন। আজকে বিলকুল ভুলে যাচ্ছেন।

রেবার কাপড়ের দিকে নজর করে চাচী বললেন, এই তো—এই জিনিষ। ঠিক এই রকম ছাপ।

রেবা বলে, যশোরে তাজুল মিঞার দোকানে কিনলাম। সে-ও বলল বটে, টাটকা চালান এসেছে কলকাতা থেকে—

মুখ কালো করে বৃদ্ধা বললেন, তা বউ-মেয়েরা যদি আমার আহ্লাদের জিনিষ বেচে দেয়—আমি তার কি করতে পারি? পাকিস্তানে সোনার দর কম—এই দেখ, আবার সোনার শাঁখা বাঁধিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তাদের জন্য। কিন্তু তবু বলব, ভুল হচ্ছে তোমার মা—বাড়ি ঝুমঝুমপুর হবে কেন? জানাপোল, দত্তপুকুরের কাছে। পাঁচ ছেলে, চার বউ, তিন মেয়ে।

তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, বর্ডার পার হতে চলল—শাঁখাগুলো খোল এবার দিদিরা।

মুখফোঁড় রেবা বলে, দিদিমা, দত্তপুকুরের কোন্ দোকানে আপনার বউ-মেয়েরা শাঁখা বেচেন, ঠিকানাটা বলে দিন। সেইখানে গিয়ে কিনব। শাঁখা খুলে দিতে মায়া হচ্ছে, খাসা মানিয়েছে—

ভুল নম্বর

গজানন তরফদার বিরাট ব্যক্তি—আকার ও ঐশ্বর্য দু-দিক দিয়েই। গদির উপরে বেজার মুখে বসে আছেন তিনি। এই মাত্র বিষম কাণ্ড হয়ে গেল—আড়তের বহু পুরানো কর্মচারী

ধনেশ্বরকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলেন। তাড়িয়ে দেবার পর এখন খারাপ লাগছে। সত্যি সত্যি গায়ে হাত তুলবার ইচ্ছেও ছিল না গজাননের। মুখে তম্বি করছিলেন, পুলিশে দেবেন—ভয় দেখাচ্ছিলেন ব্যাপারটা আস্কারা করবার জন্য।

ক্যাশমেমোর বইগুলো গজাননের নিজের জিম্মায় থাকে, তার একখানা কেউ গাফ করেছে। ধনেশ্বরের ঘাঁতঘোঁত জানা —শুধু তারই পক্ষে এ কাজ সম্ভব। চোরাই ক্যাশমেমোয় বিক্রি করে এ যাবৎ কত হাজার লুটেছে, ঠিক কি ?

বহু জেরা ও বিস্তর চেঁচামেচির পর অবশেষে ক্যাশমেমো বের করে দিল ধনেশ্বর। দরোয়ান রামপূজন সিং অতঃপর ধৈর্য রাখতে পারে না—হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে দমাদম ঘুসি ঝাড়তে লাগল। গজানন কোন দিকে পলক মাত্র না চেয়ে মেমোর পাতা উল্টে অতি-দ্রুত যোগ করে যাচ্ছেন। যোগফল দেখে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন—এমন কিছু নয়, এগারো টাকা সাড়ে সাত আনা সর্ব-সাকুল্যে। অন্যায় যদিচ, তবু গজানন এতক্ষণে নিশ্চিন্তে ঘাড় তুলে তাকালেন। ব্যাপার গুরুতর বরং ওদিকেই—মারের গুঁতোয় ধনেশ্বরের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, গায়ের এখানে-ওখানে রক্তের চিহ্ন। অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি সে থানায় গিয়ে দাঁড়ায়, গজাননেরই ছাড়িয়ে আসতে এগারো সাড়ে-সাত আনার বিশ গুণ বেরিয়ে যাবে।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন গজানন।

করিস কি ? এ কি করছিস পাজি উল্লুক গাধা ? লোভে

পড়ে করেছেই না হয় কু-কার্য—ওর সঙ্গে আমার কতকালের সম্পর্ক জানিস রে তুই ?

সহানুভূতি পেয়ে ধনেশ্বর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। সতের বছর চাকরির পর, লোভে নয়—নিতান্ত পেটের দায়ে করে বসেছে। গজাননেরও এখন হয়েছে—নির্গোলে সে বিদায় হয়ে গেলে বেঁচে যান। পুলিশের হাঙ্গামা হল না, মার-গুতোনের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে গেল—ধনেশ্বরও এই স্ফূর্তিতে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

টেলিফোন এল এই সময়।

নিজে আসবার নিশ্চয় কোন অসুবিধা ঘটেছে, তাই ফোনে জানাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে গজানন প্রত্যাশা করছেন, দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্নও আছেন মনে মনে। রিসিভার তুলবার সঙ্গে চারিদিক তাকালেন। আড়তের যে দু-একজন এদিকে-সেদিকে ছিল, সুড়সুড় করে সরে পড়ল। গজাননের নির্দেশ এইরকম। ব্যবসা-সম্পর্কিত নানা রকমের কথাবার্তা —বাইরের কাউকে সে সমস্ত শুনতে দিতে নারাজ তিনি।

চাপা গলায় গজানন সাড়া নিচ্ছেন, কালাচাঁদ ?

হো-হো—হাসির আওয়াজ ওদিকে।

কালাচাঁদ নাম দিচ্ছ ? তাই মাথা পেতে নিলাম। তোমার মতন রূপ ঈশ্বর ক-জনকে দিয়ে থাকেন ? তোমার পাশে কালাচাঁদ ছাড়া আমি কি ?

পারা-ওঠা কোণ-ভাঙা এক আয়না টাঙানো গদির পাশে।

গজানন আড় চোখে তাকালেন একটু সেদিকে। দশ-বারো দিন কামানো হয় নি, কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে। তা সত্ত্বেও—সর্ষের তেলের পাইকার কালাচাঁদ বসাক বলেছে সত্যি কথাই—চেহারা তাঁর ভাল। বয়সকালে আরও ভাল ছিল। কিন্তু সে যা-ই হোক—কাজের কথায় না এসে এ ধরনের আবোল-তাবোল বকছে কেন? এই বিকালেই মাল টেনে চুর হয়ে আছে নাকি?

বলছে, তুমি আসছ-আসছ করে সমস্ত দুপুরটা আমাদের সেই বেঞ্চিটায় বসে—

কি আশ্চর্য! গজানন যাবেন কি—কালাচাঁদেরই তো গদিতে আসবার কথা। সমস্ত গোলমাল করে ফেলেছে। গদি থেকে টাকা নিয়ে দু-জনে একসঙ্গে মুখুজ্জে বাবুর কাছে যাবেন. তিনিই বর্ডারের যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেবেন। মাতাল-দাঁতালের সঙ্গে কাজ-কারবার চালানো বিপজ্জনক। নেশার ঘোরে কোথায় কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে—আর এ যাবৎ যা-কিছু কামিয়েছেন, সমস্ত উগরে দিতে হবে সুদ সমেত। তার ওপর দেশময় নিন্দা-অখ্যাতি।

বলছে ওদিক থেকে—

অফিস পালিয়ে পার্কে এসে বসলাম, তখন ঠিক একটা। ঘড়ি দেখছি। একটু যে ছায়ায় গিয়ে বসব, তা-ও ভরসা পাই নে—বেঞ্চিতে না দেখে রাস্তা থেকেই তুমি হয়তো ফিরে যাবে। এতক্ষণে এই বাড়ি ফিরলাম। মাথা ধরেছে—তা

মাথার অপরাধ কি? দু-বড়ি এসপিরিন খেয়ে ফোন করছি।

গজানন চমকে উঠলেন। ভুল নম্বর দিয়েছে তবে তো—টেলিফোন-ছুঁড়িগুলোর যা নিয়ম। বললেন, কাকে কি বলছেন? কোন নম্বর চাচ্ছেন বলুন তো? আমার নাম হল শ্রী—

থাক, গল্প রচতে হবে না। গলা চেপে চেপে চালাকি করলে কি হবে—তোমার নাম নন্দা দেবী, বুঝতে আমার এক মিনিটও লাগে নি। চোখে না দেখেও টের পাচ্ছি—হাসছ তুমি মিটিমিটি, নিটোল গালে টোল পড়েছে। সত্যি, এত চাপা গলা কেন বলো তো? বুড়ো কর্তা কাছাকাছি আছেন বুঝি?

গজানন মুখ খিঁচিয়ে উঠেন।

নন্দা-টন্দা কোন পুরুষে চিনি নে। বলছি যে ভুল হয়েছে আপনার—

নন্দা নামটা বলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন। কারো কানে গেল না তো? এইসব আধুনিক মেয়ের নাম করাটাও অশ্লীলতারই কাছাকাছি এঁদের আমলের লোকের কাছে।

ছেড়ে দিলাম তা হলে। ভুল নম্বর—

মুখে বলেও কিন্তু ছাড়তে পারেন না। কেমন মায়া লাগে। কি কথা এবারে বলে, লোভ হয় শুনতে। কাঁচা বয়সে একবার এক বন্ধুর বাসর-ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলেন। ইঁদুর

পায়ের উপর উঠেছিল—সেই সময়টা নড়েছিলেন একটুখানি। তার পরে সে কি দুর্ভোগ! মাঘ মাসের রাত, বাঘা শীত পড়েছে। বন্ধু টের পেয়ে এক কলসি জল তাঁর মাথায় ঢালল হুড়হুড় করে। এত ভোগান্তির পরেও কিন্তু প্রেমালাপ শোনার নেশা কাটে নি—এই এতটা বয়সে আজকে আবার তার পরিচয় পাওয়া গেল।

নাছোড়বান্দা প্রেমিক ওদিকে বলছে, তা দাও ছেড়ে অসুবিধা আছে যখন। কি আর করবে? কর্তা এসে গেছেন বুঝি? *বেশ যা-হোক বের করেছ বুড়োর সামনে—ভুল নম্বর! ভারি বুদ্ধি তোমার।* কাল সকালে আমি যাব। সুশীল *সুবোধ হয়ে কর্তার সঙ্গে কি* রকম শঙ্কর-ভাষ্য আলোচনা করি, *দেখতে পাবে।* আচ্ছা, বিদায়। বিদায়ের—

বিদায়ের বস্তুটা এমন সশব্দে ব্যক্ত করল যে টেলিফোনের এ ধারে এত ব্যবধানে থেকেও ষাট বছুরে গজাননের দাড়ি-গোঁফ অবধি কণ্টকিত হয়ে ওঠে। ছি-ছি, কি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকালকার এরা? তাঁদের সময়ে বিয়ে-করা পরিবারের সঙ্গেও সারা দিনমানের মধ্যে ঠারেঠোরে একটা কথা বলবার জো ছিল না—প্রবীণেরা তা হলে গালে হাত দিয়ে বসতেন।

ছি-ছি করছেন বটে গজানন, কিন্তু কৌতুকও লাগে। ইচ্ছে করেই ভুল করে নাকি টেলিফোন-ছুঁড়িরা? এর চুপড়ির কাঁঠাল ওর চুপড়িতে বসিয়ে মজা দেখে?

তা যেন হল, কিন্তু কালাচাঁদ বসাকের গতিক কি?

পঞ্চাশ টিন সর্ষের তেল বর্ডার পার করতে হবে। মুখুজ্জে বাবুকে পান খাইয়ে অনেক টিন নিঃশব্দে চলে গেছে ইতি-পূর্বে। দু-দিককার খরচাই মুখুজ্জে নিয়ে নেন, পরে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়। এপারে ওপারে যত বিরোধ-বিসম্বাদ থাক, সীমান্ত-পাহারাদাররা কিন্তু ঐক্যবোধ ও প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিচ্ছেন। বে-আইনি মাল পাচারের যে অলিখিত বিধান আছে, উভয় অঞ্চলে তা হুবহু এক। অতএব গোলমাল হবার কথা নয়।

মোতিলাল-হীরালালের মিলে ফোন করে দেখা যাক— কালাচাঁদ সেখানে থাকতে পারে।

হ্যালো!

বেশ মানুষ কিন্তু তুমি! দেখলে, পৌঁছতে পারলাম না— তবু চুপচাপ রয়েছ। তিন-চারবার চেষ্টা করেছি তোমায় ফোনে ধরতে। বলে, নো রিপ্লাই—

গজাননের মুখ শুকিয়ে যায়, কোন অঘটন ঘটল নাকি? কালাচাঁদ আসছে না দেখে এই ফোন তাঁর আগেই করা উচিত ছিল। তা নয়—হতভাগা ধনেশ্বরের এগারো টাকা সাড়ে-সাত আনার ব্যাপারে মত্ত হয়ে ছিলেন। কালাচাঁদ বেচারার দোষ কি—বারংবার চেষ্টা করেছে। টেলিফোন-ছুঁড়িগুলো ঐরকম দায়িত্ববোধহীন—দায়সারা 'নো রিপ্লাই' বলে দিয়ে ঘুম দেয়, অথবা গল্পগুজবে মজে থাকে।

ওদিক থেকে বলছে, এতক্ষণ পরে ফুরসৎ হল! কি

কাজে ব্যস্ত ছিলে শুনি? আমি আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে—কক্ষণো না—

কালাচাঁদ অমনি করে বলছে—অভিমান করছে গজাননের উপর। হয় তো খুব নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে তাকে। মনের দুঃখে খেয়েছেও বোধ হয় দু-এক ঢোক। এমন ন্যাকা-ন্যাকা মিঠা বুলি সহজ অবস্থায় বেরোয় না তো!

গজানন অপরাধ মেনে নেন।

সত্যি, গোলমালের মধ্যে ভুল হয়ে গেছে। একটু আগে ধনেশ্বরকে নিয়ে এক কাণ্ড—চুরি করে সে ধরা পড়েছে—

খিল-খিল খিল-খিল···ওদিক থেকে যেন জলতরঙ্গ বাজছে।

খাসা কৈফিয়ৎ বানিয়েছ অলক-দা। ধনেশ্বর কোনটি বলো তো? হাতির মতো নাদুস-নুদুস, গলায় সোনার চেন, কবিতা লেখে? বাইরের ভড়ং দেখে আমি ঠিক বুঝেছিলাম, ও লোক চোর-জোচ্চোরই হবে।

সচকিত হয়ে গজানন বলল, কে আপনি? নাম কি আপনার?

গলা শুনে চেন না? আর কারো ফোন করবার কথা ছিল? সুপ্রীতির সঙ্গে সেদিন সিনেমায় গিয়েছিলে—সে-ই বুঝি?

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে গেল সহসা।

যাকগে—সংক্ষেপে সারছি—সারা দুপুর বাবা ছিলেন, তাই বেরুনো হয় নি। এখন চা-পার্টিতে যাচ্ছেন, ফিরতে রাত হবে। তুমি যদি চাঁদপাল ঘাটে এসো, খানিকটা গঙ্গার ধারে বেড়ানো

যায়। বেড়ানো শুধু নয়—বোঝাপড়াও আছে। সময় হবে—না, কাজে ব্যস্ত ? সুপ্রীতির আসার কথা-টতা আছে ?

সজোরে ছেড়ে দিল ফোন। ফোন ছাড়বার আওয়াজটুকুও গজাননের কানে পৌঁছায়। হতভম্ব হয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। এমন মানানসই পাশাপাশি ভুল নম্বর—যন্ত্রটা বোধ করি ভূতাবিষ্ট হয়েছে—খানিকটা এর কথা খানিকটা ওর কথা শুনিয়ে দিল। জুড়ে-গেঁথে বেশ একখানা প্রেমের গল্প দাঁড় করানো যায়। একালের বেপরোয়া হাসিখুশি ও মান-অভিমানের কয়েকটা ঝলক আচমকা এসে পড়ে শুকনো সেকালে রঙ ধরিয়ে গেল। টেলিফোন-মেয়েদের ভুলের দরুন কাজের ভণ্ডুল হোক, যা-ই হোক—মজা জমে ভারি চমৎকার।

বিস্তর কাজকর্ম। অন্তত বিশ জন বাইরে অপেক্ষা করছে নানারকম দরকারে। ত্রিপল-ঢাকা সর্ষের তেলের টিন ওদিকে লরি বোঝাই হয়ে বর্ডারের কাছে পড়ে রয়েছে। সমস্ত ছেড়েছুড়ে গজানন উঠে দাঁড়ালেন।

সরকার মশায় ছুটে এলেন।

কোথা যাচ্ছেন ?

শরীরটা ভাল লাগছে না ! ওদের যেতে বলে দাও—কাল শুনব।

নতুন কালের এরা ভাগ্যবান—হিংসা হয় এদের উপর। গজাননরা ঠকেছেন। বিয়ের আগে চুলোয় যাক—বিয়ের পরই

বা একসঙ্গে কাটাতে পেরেছেন কতটুকু সময়? গভীর রাতে ঘরে ঘরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে সলজ্জ পায়ে অন্ন এসে ঘরে ঢুকত। সারাদিন এক সংসারের খাটনি খেটে চোখ ঢুলু-ঢুলু—একটা হুটো অতি-সাধারণ কথাবার্তার পরই ঘুমিয়ে পড়ত। আবার ভোর না হতেই সকলের আগে উঠে উঠোনে ছড়াঝাঁট ও গোবর-মাটি দেওয়া···

গৃহিণীও অবাক হয়ে গেছেন।

এখন যে?

বলো কেন, কাজ করবার জো আছে? ধনেশ্বরের ঐ ব্যাপার। টেলিফোন ধরলাম—ভুল নম্বরের ঠেলায় অস্থির। চলো অন্ন, বেড়িয়ে আসিগে একটু। গঙ্গার ধারে যাই চলো।

অন্নপূর্ণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, সময়টা ঠাউরেছ ভালো। খোকা জ্বরে হাঁসফাঁস করছে, তার উপর জামাই আসছে। একটা ফর্দ করে সরকার মশাইকে বাজারে পাঠাবার কথা ছিল—পাঠিয়েছ?

বড্ড ভুল হয়ে গেছে। পাঠাচ্ছি এক্ষুণি—

গজানন তাড়াতাড়ি জামাতৃ-আপ্যায়নের ফর্দ করতে বসলেন।

আনারস

টলতে টলতে মীরা এসে ঢুকল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন।

আনারস কি হল ?

ধরণী বড় একটা হিসাব নিয়ে পড়েছে। জবাব দিল, জানি নে—

ক্ষিধের জ্বালায় মরি-মরি করে রান্নাঘরে গিয়ে টুকরো করলাম, নুন মাখালাম। টুলের উপর রেখে কলতলায় মুখ ধুতে গেছি—অমনি লোপাট !

বেরালে খেয়েছে হয় তো—

বেরালে আনারস খেতে পারে ?

কেন পারবে না ? কচমচ করে আস্ত আস্ত ইঁদুর চিবিয়ে খায়—এ তো ক-কুচি আনারস !

কাঁদো-কাঁদো হয়ে মীরা বলে, বাটিটাও নেই। বাটিসুদ্ধ কচমচ করে খেল নাকি ? কাল থেকে নিরম্বু আছি—যা খাচ্ছি, বমি হয়ে যায়। আমার মুখের আনারস যে চুরি করেছে, ঈশ্বর তাকে প্রতিফল দেবেন।

এবার ধরণী মুখ তুলে তাকাল। বলে, হিসেবটা শেষ করে

এখনই খাতা ঘাড়ে অফিসে ছুটতে হবে। এখানে হল্লা না করে খোঁজ করোগে বেরালে খেয়েছে, কিম্বা আর কি হয়েছে।

থতমত খেয়ে মীরা পালাল। নির্গোলে হিসাব সমাধা করবার জন্য ধরণী দরজায় খিল দিল এবার।

বছর ছয়েক আগেকার এক ছবি। পশ্চিমের নানা জায়গা ঘুরে মীরাকে কয়েকটা দিনের জন্য বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। মীরার মা ভুবনমোহিনীও আছেন সঙ্গে। ট্রেন থেকে নামল রাত সাড়ে-ন'টায়। তখন বাস ছেড়ে গেছে। পরের বাস ভোরবেলা। এতক্ষণ পড়ে থাকতে হবে স্টেশনে।

মীরার আজ স্নান হয় নি—অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলের বোঝা। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে মাধুরী যেন আরও বেড়েছে।

ধরণী বলে, কিছু খাবে না মীরা? হতেই পারে না।

শাশুড়ির দিকে চেয়ে আবদার করে, বকে দিন তো আচ্ছা করে।

ভুবনমোহিনী হেসে বলেন, কি পাওয়া যায় এখানে?

কি খেতে চায় বলুক। সন্দেশ-রসগোল্লা-পানতুয়া—

মাগো! মুখ বাঁকিয়ে মীরা বলে, মিষ্টি গিলতে যাচ্ছি আমি এখন!

মিষ্টি না চলে, লুচি-সিঙাড়া—

ভেজিটেবেল-ঘিয়ে ভাজা। ঘেন্না করে।

ধরণী শেষ চেষ্টা হিসাবে বলে, একটা হোটেলও আছে দেখে

এলাম। বেশি পয়সা দিয়ে আলাদা ভাত রাঁধিয়ে আনতে পারি। গরম ভাত, আলু-ভাজা, মাছ-ভাজা, দই বা দুধ যেটা পছন্দ হয়—

ভুবনমোহিনী বললেন, পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে ভাত খাবার মেয়েই বটে! ফল-টল পাও তো তাই দেখ বরং।

মীরা বলে, আনারস যদি পাওয়া যায়—

ধরণী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মীরা তখনই আবার মানা করে, থাকগে। এতখানি রাত্তির হয়েছে—কোথায় খুঁজে বেড়াবে এখন?

অনাবশ্যক জবাব না দিয়ে ধরণী জুতোয় পা ঢুকিয়ে দিল। মীরা কাছে—অত্যন্ত কাছে এসে বলল, শিগগির ফিরো কিন্তু। ভয় করবে।

ধাবমান ধরণী মুহূর্তে স্টেশনের সীমা ছাড়াল। ফলের দোকান অদূরে।

কি চাই মশাই?

আনারস—

এখন আনারস—কি বলেন? আম আছে—উৎকৃষ্ট ন্যাংড়া আম। টাকায় দুটো।

ফলের দোকান আর নেই?

বাজারে আছে। কোথাও পাবেন না মশায়। আম না কেনেন, মর্তমান কলা নিয়ে যান।

এক সাইকেল-রিক্সা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সাঁ করে চলে এল।

আসেন। আমি নিয়ে যাচ্ছি বাজারে।

কদ্দূর?

এই তো—সোজা দক্ষিণে—

চলেছে তো চলেইছে। অধীর কণ্ঠে ধরণী প্রশ্ন করে, কদ্দূর রে?

এই যে সামনে—

স্টেশন থেকেই তো এক কথা বলছিস। দক্ষিণে যেতে যেতে বে-অব-বেঙ্গলে গিয়ে না পড়ি!

বাজার মিলিল অবশেষে। ফল-পটিতে ঢুকল। চারটে দোকানের মধ্যে তিনটে বন্ধ হয়ে গেছে। এটারও ঝাঁপ ফেলছে। ধরণী হাঁ-হাঁ করে পড়ল।

রোখো। আনারস আছে তোমার এখানে ভাই?

আষাঢ়-শ্রাবণে আসবেন। এক ঝুড়ি দু-ঝুড়ি—যা দরকার নিয়ে যাবেন।

আজকে চাই যে একটা—

দু'টি লোক দাবা খেলছিল। তাদের একজন প্রশ্ন করে, বলবৎ রোগি বুঝি?

ধরণীর দিকে তাকিয়ে দেখলও বটে তাই। বাড়িতে মুমূর্ষু রোগি থাকলে এমনি ব্যাকুল অবস্থা হয় মানুষের।

দয়াপরবশ হয়ে লোকটা বলে, শেখপাড়ায় চলে যান।

ছমির শেখের বাগানে দেখেছি একটা অকালের আনারস। অভাবি লোক—বেচবেও।

খালের ধারে রিক্সাওয়ালা নামিয়ে দিল। বলে, সাঁকো পার হয়ে হেঁটে চলে যান, হুজুর। সামনে শেখ-পাড়া।

তুমি 'সামনে' বলে যখন দেখাও, ভয় হয়ে যায়।

উ-ই যে ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। দেখতে পাচ্ছেন না?

জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছিল ঠিকই। হাঁটতে হাঁটতে তবু পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। ডাকাডাকি করতে ছমির শেখ বেরিয়ে এল।

আনারস আছে শুনলাম।

ছিল তো কর্তা। এই সাঁজের বেলা রাজেন বাবু এসে নিয়ে গেল। বড্ড পেকে গেছে—রাখবার জো নেই। নইলে এমন অকালের ফল মাত্তোর একটা টাকায় নিয়ে যায়?

সন্ধ্যাবেলা নিয়ে গেছে তো?

রোখ চেপে যায় ধরণীর।

রাজেন বাবুর বাড়িটা কোন দিকে, বল তো শেখ সাহেব।

চৌরাস্তা থেকে ডাইনে বাঁকবেন। টিনের ঘর—দোকান আছে। এক ডাকে সবাই চিনবে।

রিক্সায় উঠে ধরণী বলল, রাজেন বাবুর বাড়ি—

রাজেন বাবু তো তিন জন—বেঁটে-রাজেন, গেছো-রাজেন, ভূতো-রাজেন—

চৌরাস্তা থেকে ডাইনে বেঁকে। দোকান আছে ভদ্রলোকের।

বুঝলাম। গেছো-রাজেন বাবু হলেন তিনি।

রিক্সার আওয়াজ পেয়ে হেরিকেন হাতে রাজেন দেখা দিল।

ডাক্তার বাবু এলেন?

আজ্ঞে না। আমি অন্য লোক—বিষম দরকারে এসেছি। একটা আনারস নিয়ে এসেছেন—শেখ-পাড়া থেকে। যদি এখনো খরচা না হয়ে থাকে, পেলে বড্ড উপকার হয়—

রাজেনের মা-ও এসেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধা। তিনি বলেন, দিয়ে দে রাজেন। দায়ে না পড়লে খোঁজে খোঁজে এসেছে? এক গাদা ডালিম-বেদানা দিয়ে গেল খোকার মেসো —আনারস কি হবে? এর বাড়ি বোধ হয় এখন-তখন—

ধরণীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা, শেষ-খাওয়া খেতে চাচ্ছে বুঝি?

ধরণী সংক্ষেপে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—খেতে চেয়েছে।

আহা-হা!

সুপক্ক আনারসটা বৃদ্ধা নিজেই বের করে আনলেন।

রাজেন বলে, পাঁচ টাকা লাগবে। আড়াই টাকায় কিনেছি। যাতায়াত, খোঁজাখুঁজি, তা-ও ধরুন—

কিন্তু ছমির শেখ বলল, এক টাকায় কিনেছেন।

যান তবে সেখানে।

না না, রাগ করবেন না—

পাঁচ টাকার নোট দিয়ে ধরণী রিক্সায় চাপল।

জোরসে হাঁকাও—

স্টেশনে ফিরে পরম পুলকে সে লাফিয়ে নামল। রিক্সাওয়ালা বলে, ভাড়া বিবেচনা করে দেবেন, হুজুর। ধরেন সেই কখন থেকে ঘুরছি—

কত ?

আট টাকা—

বলিস কি রে! চারটে টাকা নে—

সঙ্গে সঙ্গে কথা ও কণ্ঠস্বর অন্য রকম হয়ে গেল রিক্সাওয়ালার।

মাইরি নাকি! আরে শোন ও ভাই, সন্ধ্যে থেকে ঘোরাচ্ছে—লোকটা এখন বলে চার টাকা দেবে।

হাঁক শুনে চার-পাঁচটা রিক্সাওয়ালা ভিড় করে এল।

ভিক্ষে দিচ্ছ ?

ধরণীও ভয় পাবার লোক নয়। কিন্তু অনতিদূরে মীরারা আছে। বচসা বাধলে কি মনে করবে ? আট টাকা দিয়েই ছুটল সে ওয়েটিং-রুমে।

ইজি-চেয়ারে মীরা চোখ বুজে আছে। ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না—গায়ে নাড়া দিতে হল। চোখ মেলে মীরা বলল, উঃ, কখন গিয়েছ! একলা একলা এমন ভয় করছিল!

এত লোকজন স্টেশনে—একলা হলে কি করে ?

ঘুম-ভাঙা অলস দৃষ্টি মেলে স্নিগ্ধ মধুর হাসি হেসে মীরা বলে, তুমি না থাকলে বড্ড একলা লাগে আমার।

আনারস তুলে ধরল ধরণী। মীরা বলে, আনারস আনতে

গেলে কেন? ছাড়ানো কি সোজা! কোথায় ছুরি-বঁটি, কোথায় কি! আনারস যাচ্ছেতাই লাগে খেতে।

তুমিই তো বললে—

ভুল শুনেছ। আনারস নয়, আম। ন্যাংড়া আম নতুন উঠেছে—

বিনা তর্কে ধরণী বলে, তাই হবে। আচ্ছা, নিয়ে আসছি আম—

এবং সে ছুটে বেরুল।

দরজায় খিল এঁটে হিসাবের খাতা সরিয়ে রেখে ধরণী দেরাজ থেকে আনারসের বাটি বের করল। মীরার পায়ের শব্দে এই বাটি দেরাজে ঢুকিয়েছিল। কপ-কপ করে কুচিগুলো মুখে ফেলছে। সিটে বাইরে ছড়াল না—ঐ বাটিতেই রেখে আবার দেরাজে রেখে দিল। ফাঁক বুঝে ফেলে দেবে এক সময়।

রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে লতু এ-ঘরে এসে বলল, জড়সড় হয়ে আছ কেন দাদু? ভয় করছে?

বীরেন্দ্রবিজয় গর্জন করে উঠলেন।

ভয়? ভয় হচ্ছে মনের বিকার। মন শক্ত করো, ভয় উবে পালাবে। নেলসন কি বলতেন, জান?

হাসি-হাসি মুখে লতিকা বলে, কি?

এই আমি যা-সমস্ত বলে থাকি। ভয় ছিল না বলেই তো নেলসন ওয়াটার্লু জিততে পারলেন।

আপনিও পারতেন দাদু, যদি আপনাদের আমলে বাঙালিকে লড়াইয়ে নেবার রেওয়াজ থাকত।

বীরেন্দ্র মাথা নেড়ে প্রশংসাটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেন।

লতু আবার বলে, আপনার মতো সাহস ক-জনের? মা-ও তাই বললেন। তোর দাদু এসে গেছেন—আর কি! আমরা তবে কথকতা শুনে আসিগে।

বীরেন্দ্রবিজয় বললেন, তুইও গেলি না কেন? একাই আমি বাড়ি পাহারা দিতাম।

লতিকা হেসে বলে, হরিনামে আমার কানে তালা লাগে। মা তাই বললেন, মাংসটা তবে রান্না কর্ বসে বসে।···সত্যি দাদু, আপনি না এসে পড়লে মা ওঁদের যাওয়া হত না। বাবা ফিরবেন—সাড়ে-ন'টার গাড়ি বিদায় করে দিয়ে তারও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে। এই জঙ্গলপুরীর মধ্যে ততক্ষণ মা আমি আর ছোট ভাইটা—

বীরেন্দ্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, দুটো ভাঁট-নাটা-কাল-কাসুন্দে—এই আবার জঙ্গল নাকি? টেরাই-এর জঙ্গলে ঘুরেছি, সুন্দরবনে ঘুরে বেড়িয়েছি এক নাগাড় দেড় মাস—

একটু দম নিয়ে আবার বলেন, একবার চিতেবাঘের চোখের মধ্যে আঙুল ঘুলিয়ে সরে পড়েছিলাম। কত আর বয়স তখন—বাইশ-তেইশ।

লতু মৃদুকণ্ঠে বলে, বাঘ এখানে নেই দাদু। তবু কিন্তু ভয়ের জায়গা।

সাপ ?

খাটে বসে ছিলেন বীরেন্দ্রবিজয়—পা দুটো তুলে উবু হয়ে বসলেন।

আলোটা বাড়িয়ে দে লতু। আর তোরা ভুল করিস—কার্বলিক-এসিড ছড়িয়ে দিস নে কেন চারদিকে ?

সাপও নয় দাদু, ভূত—

ভূত-টুত মিছে কথা।

আমরাও তাই ভাবতাম, এই কোয়ার্টারে আসবার আগে পর্যন্ত। কিন্তু—

দেখেছিস ভূত কখনো ?

দেখেছি। তোমাকেও দেখাতে পারি। আজ শনিবার তো—আজকেই দেখাব। সাড়ে-ন'টার দেরিও নেই।

সাড়ে-ন'টায় কি হবে ?

ট্রেন বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বারাণ্ডায় ভূত এসে দাপাদাপি করে। কড়া নাড়ে, হাঁক-ডাক করে এক এক দিন।

সেই মর্মান্তিক কাহিনীটা লতিকা বলল—

বছর দুই আগে এখানকার স্টেশন-মাস্টার ছিলেন সদানন্দ

বাবু। তাঁর বড় ছেলে কলকাতায় চাকরি করে। শনিবার শনিবারে বাড়ি আসত এই সাড়ে-ন'টার ট্রেনে। গুমটির কাছে রেল লাইন পার হয়ে কোয়ার্টারে আসতে হয়—লাইন পার হবার সময় ছেলেটা ইঞ্জিনের তলায় কাটা পড়ে। তারপর থেকে এই ব্যাপার। কেউ তাই এ স্টেশনে থাকতে চায় না। বাবাও পালাই-পালাই করছেন।

বলিস কি রে?

দেখতে পাবেন এক্ষণি দাদু। আমি দেখে ফেলেছিলাম একদিন জানলা দিয়ে। রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে ভূতের সর্বাঙ্গ দিয়ে; মুণ্ডু ছেঁচে গিয়েছে, চোখ দুটো তার মধ্যে থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিন্তু পায়ে জুতো আছে ঠিকই—মচমচ করে বারাণ্ডায় উপর উঠে আসে। ট্রেন ঐ থামছে, দেখবেন এখনই—

ট্রেন এসে চলে গেল। অনতিপরে—লতিকা মিথ্যা বলে নি তো—জুতোর আওয়াজ বারাণ্ডায়।

লতিকা চোখ ইসারা করে। ফিসফিসিয়ে বলল, জানলা দিয়ে দেখুন তাকিয়ে। যেমন বললাম, দেখতে পাবেন। গা কাঁপছে দাদু, আমি পালাই—

লতু সত্যি সত্যি পিছনের দরজা খুলে ফেলল।

কড়া নাড়ল ওদিকে বাইরে। দুঃসাহসী বীরেন্দ্রবিজয় তড়াক করে খাট থেকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং দরজা খুলে ভূতের মুখোমুখি দাঁড়াবার কথা—

তা নয়, চক্ষের পলকে তিনি নতুর আগে আগেই পিছন-দরজা দিয়ে ছুটে বেরুলেন। ভূত বিষম জোরে দরজা ঝাঁকাচ্ছে। লতু তখন খিল খুলল।

ঘরে ঢুকে ভূত বাহুবেষ্টনে বাঁধল লতুকে। হেসে হেসে লতু তখন বলছে. দাদুকে তাড়াবার তালে ছিলাম। দোর খুলতে তাই দেরি হল। বুড়োমানুষের ভ্যানর-ভ্যানর কাঁহাতক ভাল লাগে! মা'র আসতে এখনো আধ ঘণ্টা—এই সময়টুকু দু-জনে একা-একা থাকা যাবে।

এই গাড়িতে আসছি—চিঠিটা তা হলে ঠিক পৌঁচেছে?

দি রয়্যাল হোটেল

ছোট ছিলাম। দি রয়্যাল হোটেলের সম্পর্কে সম্ভ্রমের অন্ত ছিল না। কলকাতার ট্রেন সে সময় রাত দশটা আন্দাজ পৌঁছত। হোটেল বেশি দূর নয় স্টেশন থেকে। রাস্তার পাশে কাঁচা-ড্রেনের উপর তক্তা দেওয়া ছিল যাতায়াতের জন্য। সেখানে বাঁশের খোঁটার সঙ্গে হেরিকেন বাঁধা। সে আলোয় পথ দেখা যেত না—কালিঝুলিতে এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত যে, হেরিকেনটাই দেখা যেত অনেক কষ্টে। আলো হল নিশানা—এইখানে দি রয়্যাল হোটেল, কালো হেরিকেন

দেখে বুঝে নিতে হবে। আরো তিনটে হোটেল আছে, কিন্তু রয়্যাল হোটেলের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।

সেবার পূজোয় বাড়ি যাবার সময় আটকা পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। বাড়ি ওখান থেকে বাইশ মাইল। মোটরবাস সবে চলতে শুরু করেছে ওসব অঞ্চলে, একখানা মাত্র যায় ও ফিরে আসে। বৃষ্টিবাদলা খুব হয়ে গেছে কয়েক দিন ধরে, রাস্তা বিষম খারাপ। এবং সবে ধন নীলমণি সেই বাসখানা উল্টে আছে রাস্তার পগারে। এখন ঘোড়ার গাড়ি মাত্র ভরসা। অথবা পায়ে হাঁটা। পায়ে হেঁটে অতদূর যাবার বয়স তখন নয়। ঘোড়ার গাড়ির চারটে সিট ভিতরে, ছ'টা ছাতে; আর কোচবাক্সে বসে যায় দু-জন। এত নিয়েও চড়ন্দার শেষ করতে পারছে না। রাত দুপুরে বেরোয়, আর পৌঁছে দেয় পরদিন দেড় প্রহর বেলায়। মাঝ পথে একবার ঘোড়া বদল করে নেয়।

সবাই সর্বাগ্রে বাড়ি যেতে চায়। ভাড়া বাড়িয়ে বারো আনার জায়গায় বারো সিকে করেছে। মানুষের তখনও চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল; চতুর্গুণের বেশি চাইতে ভরসা পায় নি কোচওয়ানেরা। তবে কথা শোনাতে ছাড়ত না।

কেন, মোটরে কি বলছে মশাই? দশ দিন খানায় পড়ে জল খাচ্ছে—উঠে এসে পৌঁছে দিতে বলেন না তাদের!

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। যাওয়ার উপায় হয় না।

ঘুরে ঘুরে বেড়াই। দিনের মধ্যে দশবার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আস্তাবলের সামনে।

হোটেলের মালিক অভিলাষ। তার বুঝি মনে লাগে। কাছে ডেকে নিয়ে বলল, মুখ শুকনো করে আছ কেন খোকা? জলে পড়ে যাও নি। খাও-দাও স্ফূর্তি করে পূজো দেখে বেড়াও এখানে। দশমী-একাদশীতে মোটে ভিড় থাকবে না, ভাড়া ফের বারো আনায় নামবে। কোচওয়ান বেটারাই খোশামোদ করবে দেখো। তখন মজা করে বাড়ি যেও।

সেই মজা করা ছাড়া উপায়ও নেই অন্য-কিছু। দি রয়্যাল হোটেলের চার্জ প্রতি বেলায় দশ পয়সা। ভরপেট খাওয়া, মাথার তেল এবং রাতে শোওয়ার মাদুর। আর যারা তামাক খায়—যত ছিলিম খুশি সেজে খেতে পারো, শুধু অভিলাষকে টানতে দেবে এক-একবার।

মহাষ্টমীর দিন অভিলাষ ঘিয়ের লুচি, বেগুন-ভাজা, কুমড়োর ছক্কা ও মোহনভোগ খাওয়াল। বলে, এ ও দিচ্ছি ঐ দশ পয়সায়। অত লাভ-লোকসান দেখতে গেলে চলে না। বছরকার দিন—বাড়ি যেতে পারলে কত কি ভালমন্দ খেতে, আমি ছাইভস্ম কি-বা খাওয়ালাম! রান্না কেমন হয়েছে? ছক্কাটা নিজে পাক করেছি।

সত্যি, কি অপরূপ রেঁধেছিল ঐ সামান্য অতি-সাধারণ তরকারিটা! মনে করতে গেলে আজও জিভে জল আসে।

অভিলাষ বলে, গোড়ায় সমস্ত আমি একা রান্না করতাম।

দুজন মাত্র ছিলাম—আমি আর রাজকুমারী। আমি রাঁধি, সে জোগাড় দেয়।···ও রাজকুমারী, হল তোমার পান সাজা? বাবুদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? কাজকর্ম আছে তো সকলকার!

দাওয়ার প্রান্তে মাদুরের উপর অভিলাষ পা ছড়িয়ে বসে আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে এসে বসছে ওখানে। পাশে ক'টা বেঞ্চি আছে—সেখানেও বসছে কেউ কেউ।

অভিলাষ গল্প করে, কি দিনই গেছে! ঐ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে খদ্দের ডাকাডাকি করতাম···মুগের ডাল, চিংড়ি পুইঁডাটা চচ্চড়ি, ইলিশ মাছ—এখনো গো, কে যাবে এসো চলে। এখন ডাকতে হয় না, আপনি এসে সকলে পায়ের ধূলো দেন। এক-একদিন ভাত ফুরিয়ে যায়, তিনটে বামুনেও জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না। সমস্ত বাপ ঠাকুরদা'র পুণ্যে।··· কই রাজকুমারী হল তোমার?

রাজকুমারী বেরিয়ে এসে ডাবর ভরতি সাজা পান দিয়ে গেল। পান সাজার কাজটাই শুধু তার। তা ঠিক হাতেই ভার পড়েছে। ফর্শা চেহারা, এক পিঠ চুল, সরম [illegible] চলন—এত কাল পরে এইটুকুই মনে আছে সেদিনকার রাজকুমারী সম্পর্কে।

হাত বাক্সর ডালার উপর ফোকর কাটা—অভিলাষ পয়সা গুণে গুণে তার মধ্যে ফেলে, আর পানের খিলি দেয় দুটো করে। অভিলাষ পান হাতে তুলে দিলে বুঝতে হবে, পাওনা গণ্ডা পেয়ে গেছে। ব্যাপারটা ক্যাশমেমোর সামিল।

দেনা পাওনা মেটানো অবশ্য একেবারে। অভিলাষ কারো বামুন খুড়ো, কারো বা বামুন দাদা। দেখা হলেই—ভালো আছেন রাহুত মশায়, বাড়ির খবর ভালো? মামলার ব্যাপারে বুঝি? ক'দিন থাকা হবে? উকিল দিবেন কাকে? মন্মথ চাটুজ্জে…এই সেরেছে! কাজ করবে ভালো, কিন্তু হাড় অবধি চুষে ছাড়বে।

বছর ত্রিশ পরে এই সেদিন আবার গিয়ে পড়েছিলাম সেই মহকুমা শহরে। স্টেশনে নেমে আন্দাজ মতো গেলাম হোটেলের জায়গায়। ধাঁধা লাগে। ইলেকট্রিক হয়ে ইদানীং সারা শহর ঝিক্‌মিক্ করছে, কিন্তু এদিকটা অন্ধকার। মানুষ জন দেখি না, হেরিকেনও টাঙানো নেই পুরানো দিনের মতো।

একটা রাস্তার লোক ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, রয়্যাল হোটেল এটা ভাই?

বুঝতে পারে না। বলি, অভিলাষ ঠাকুর গো! তাঁকে খুঁজছি।

লোকটা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। হ্যাঁ, এই—

নিঃসংশয় হয়ে দাওয়ার উপর উঠে ডাকাডাকি করছি।

ঠাকুর মশায় ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি? ও ঠাকুর মশায়!

একজন অবশেষে দরজা খুলে বেরুল।

অভিলাষ ঠাকুরমশায়কে ডাকছি আমি—

আপাদমস্তক ঠাহর করে দেখি। নাতো—এ সে লোক নয়।

অভিলাষ চক্রবর্তী?

আজ্ঞে, আমিই—

রুদাঘরায় বাড়ি?

আমারই ছিল। এখন কিছু নেই। ভিটেয় সর্ষের চাষ হয়।

হোটেল ছিল আপনার?

ছিল মানে? আছে এখনও।

ক্ষুণ্ণ হয়েছে অভিলাষ। আরও জোর দিয়ে বলল, হাড় ক'খানা যদ্দিন আছে, ততদিন হোটেল থাকবে। দি রয়্যাল হোটেল!

আঙুল দিয়ে দেখাল বেড়ার গায়ে গোঁজা টিনের চাকতি একখানা। এককালে কিছু লেখা ছিল, তার চিহ্ন রয়েছে। হোটেলের সাইনবোর্ড এটা।

বলে, দিনকাল খারাপ। খদ্দেরপত্তোর তেমন নেই। তা এক দিক দিয়ে ভালোই। বুড়ো মানুষ···আরামে আছি। সন্ধ্যের পরে লেপ মুড়ি দিই, কেউ ঝামেলা করতে আসে না।

এই লোক যদি অভিলাষ হয়—বলছে যখন, ধরেই নেওয়া যাক। অভিলাষ হেসে উঠল, কান্নার মতো হাসি।

আমি খাবো ঠাকুরমশাই—

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে অভিলাষ বলে, খাবেন? বাঃ বাঃ! কিন্তু ভোজ্যনিলয়ে গেলেন না যে?

জবর হোটেল দেখে এসেছি বটে পথে—ভোজ্যনিলয়! কারো নজর এড়াতে পারে না। গানের পর গান চলেছে

লাউডস্পিকারে। সে গান এতদূর এসেও কানের পর্দায় মুগুর মারছে।

আমি রয়্যাল হোটেলের পুরানো খদ্দের। সে আমলে কত খেয়ে গেছি। ভোজ্যনিলয়ের মত আলো আর গোলমাল আমার সহ্য হবে না।

বুড়ো-থুত্থুড়ে, কণ্ঠার হাড় বের-করা অভিলাষের গায়ে যেন অসুরের বল এল। দোচালা লম্বা ঘরখানায় সারি সারি খোপ করা। অভিলাষ দরজায় দরজায় ঘা দিয়ে বেড়াচ্ছে—

ওঠো তৈলক্ক, ওঠো ক্ষেন্তির মা—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো তোমরা সব। উনুনে আঁচ দাও, বাটনা করো। খদ্দের এসেছেন—পুরাণো খদ্দের। আমরা ভাত না দিলে উপোস করে থাকবেন যে!

যেন উৎসব পড়ে গেল প্রায়-পরিত্যক্ত হোটেল-বাড়িতে। সবাই সেই পুরাণো আমলের লোক। কত জাঁক দেখেছি সেকালে ক্ষেন্তির মা'র। পাটার পর পাটা মশলা বেটে যাচ্ছে—শ্রান্তি নেই, নোড়ার ঘটর-ঘটর আওয়াজের সঙ্গে বাজছে তার হাতের চুড়ি-বাউটি। সমস্ত দিন ধরে বাটনা বাটছে, জল নিয়ে আসছে বালতি বালতি। তারই মধ্যে যে খদ্দের যখন যা জিজ্ঞাসা করছে, হেসে হেসে জবাব দিচ্ছে।

অভিলাষের পুরাণো দলবল বেরিয়ে পড়ল বিশীর্ণ এক এক প্রেতমূর্তির মতো। কাজের ক্ষমতা নেই, অন্য কোন-

খানে এদের জায়গা হবে না—অভিলাষের এই পিঁজরাপোলে আশ্রয় নিয়ে আছে। টেমি জ্বেলেছে—আলো আর কতটুকু, ধোঁয়াই বেরুচ্ছে গলগল করে। অভিলাষ নিজে রান্নায় বসেছে। তেল কল কল করে উঠল কড়াইতে। সারা দিনের ধকলে আমি মাদুরে গড়িয়ে পড়েছি—ফোড়নের গন্ধ নাকে আসছে তন্দ্রার মধ্যে···

খেতে বসিয়ে অভিলাষ জিজ্ঞাসা করে, রান্না কেমন হয়েছে?

কিন্তু সে অভিলাষ আর নেই—না চেহারায়, না কাজের নৈপুণ্যে। কি ঘ্যাঁট রেঁধেছে, গলা দিয়ে ঢুকতে চায় না। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সে কথা বলতে পারি নে। বলি, চমৎকার!

আরও বাড়িয়ে বললাম, আমার মায়ের রান্নার যে স্বাদ পেতাম, কতকাল পরে তাই আবার মুখে পড়ল।

অভিলাষ একমুখ হেসে জোর করে সেই তরকারি আরও দু-হাতা পাতে ঢেলে দেয়। বলে, খান—খান। আপনি হলেন পুরাণো খদ্দের। প্রথম হোটেল খুলে যখন নিজে রাঁধতাম, বাবুরা বলতেন—অভিলাষের হাত ধোওয়া জলও যেন অমৃত।

কি হয়েছে? এত রাত্তির অবধি কেরোসিন পোড়াচ্ছ কেন?

ঝঙ্কার দিয়ে রাজকুমারী খাবার-ঘরে ঢুকল। ত্রিশ বছর

বয়স বেড়েছে রাজকুমারীর, তবু রূপ আছে। এতক্ষণের মধ্যে এই কেবল একটা জীবন্ত মানুষ দেখলাম।

অভিলাষ হেসে বলে, খদ্দের এসেছেন রাজকুমারী। আরো কত হোটেল রয়েছে, কিন্তু পুরাণো খদ্দের বলে খোঁজা-খুঁজি করে এসে পড়েছেন। কচু বেগুনের একখানা ডালনা রাঁধলাম নারকেলের দুধ দিয়ে। কি রকম হয়েছে, শোন ওঁর কাছে। তোমার জন্য বাটিতে আলাদা করে ঢেলে রেখেছি।

রাজকুমারী মুখ বাঁকিয়ে বলে, আমি খেতে পারিনে ওসব ছাইভস্ম।

অভিলাষ লজ্জা পেয়ে বলে, দিনকাল খারাপ—তোমার জন্য পোলয়া-কালিয়ার কে জোগান দিচ্ছে বলো? আর আছে ওবেলার একটু মুসুরির ডাল।

তা জানি। তাই ব্যবস্থা করে এসেছি। দু-খানা কাঁচা চপ সরিয়ে রেখেছিলাম। তেলে একটু ভেজে নিয়ে তাই দিয়ে খাব।

কাপড়ের ভিতর থেকে কলাপাতায় জড়ানো চপ বের করল। বলে, তোমাদের রান্না খেয়ে মানুষ বাঁচে না। বেঁচে থাকা যায় হাড়গিলে হয়ে—যেমন তোমরা এক একটা।

রান্নার নিন্দেয় অভিলাষ মরমে মরে গেছে। বিশেষ আমার মতো এই বাইরের খদ্দেরের সামনে। মুখ কালো করে সে বলে, আমি বলি রাজকুমারী, খাওয়াটাও ভোজ্যনিলয়ে ব্যবস্থা

করে নাও। কাজ করবে ওখানে, খাবে এখানে এসে—সেটা ঠিক হচ্ছে না।

রাজকুমারী যাচ্ছিল চপ ভাজবার ব্যবস্থা করতে। মুখ ফিরিয়ে তপ্ত কণ্ঠে বলল, ম্যানেজার আজকেই বলছিলেন সে কথা। তুমি ছাড়ো না, তাই সম্বন্ধটুকু ছিল। তা বেশ, কাল থেকেই খাব ওখানে।

শুয়ে পড়েছি। ঘর অন্ধকার। অভিলাষ এক সময় এসে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকছে, বাবু ঘুমোলেন নাকি?

উঁহু—

ভোরবেলা বাবু চলে যাচ্ছেন। তাই ভাবলাম, পুরাণো খদ্দের—একটু আলাপ-সালাপ করে আসি।

রাত দুপুরে এখন আলাপ-পরিচয়ে ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনটাই নেই। সভয়ে তাই চুপ করে থাকি।

অভিলাষ বলে, কলকাতায় থাকেন বাবু, আপনি আমার একটা কাজকর্ম ঠিক করে দেন। মোট বওয়া ঝাড়ু দেওয়া—যা বলবেন তাই। হোটেল চলবে না—তুলে দেবো আমার হোটেল। একটু যদি 'হাঁ' বলেন, সাইনবোর্ড এক্ষুণি খুলে নর্দামায় ফেলে আসি।

কিন্তু 'হাঁ' এর জন্য তিলার্ধ দেরি না করে দুমদুম করে মাটি কাঁপিয়ে সে বেরিয়ে গেল—বোধ করি সাইনবোর্ড ফেলে দেবার অভিপ্রায়ে।

কলম ও কোদাল

চাঁদা চাইতে এসেছি। আমার নাম ভবতারণ দাস। আর বোধহয় পরিচয় দিতে হবে না—

ভদ্রলোক গদ-গদ হয়ে উঠলেন।

বিলক্ষণ! আপনার মতো মানুষ—কে না জানে আপনাকে ত্রিভুবনের মধ্যে? পরম সৌভাগ্য, আমা হেন অভাজনের কাছে এসেছেন।

কিঞ্চিৎ জেরা করতে লোভ হয়।

কি করি বলুন তো?

আপনি—চিত্তরঞ্জন দাস···মস্ত বড় ব্যারিস্টার আপনি। বলুন, ঠিক কি না?

বড় ব্যারিস্টার—সব দিক দিয়ে বড়—ছিলেন একজন ঐ নামে। কিন্তু শুনতে ভুল করেছেন। আমি ভবতারণ দাস—বই লিখি।

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ঠিক, গোড়ায় গলদ! কিন্তু নামের গোলমাল হোক, যা-ই হোক—আপনার বই আগাগোড়া কণ্ঠস্থ। একজামিন করুন, লাইনকে লাইন বলে যাচ্ছি।

প্রবল কণ্ঠে চেঁচাতে লাগলেন, শুনছ গো, সেই যেতোমরা ধন্য-ধন্য করো যাঁর বই নিয়ে, তিনি পায়ে হেঁটে এসে উপস্থিত। দেখসে-এসে—দেখে চক্ষু সার্থক করো।

ডাকতে ডাকতে অবশেষে তিনি এলেন। আসতে দেরি হল—কিন্তু সঙ্গত কারণ আছে। প্রচুর জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন।

কর্তা বললেন, জান কে ইনি? তারণচন্দ্র দাস। সেই যে কি বই—আরে, তোমরাই তো বলছিলে, অমন বই আর হয় না—

তিনি বললেন, স্বর্ণলতা—

দূর! সে লিখেছে রবি ঠাকুর। এঁর বই—কি নামটা ভালো? এমন মুশকিল হয় তোমাদের নিয়ে—সমস্ত ভুলে মেরে দাও।

মেয়ে এলো। বেণী-দোলানো আধুনিকা।

জানিস বেবি, বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছেন দেশ-বিখ্যাত মানুষ। লেখেন। সেই যে তোরা খুব নাম করে বেড়াস ভবসিন্ধু বড়ালের—

বেবি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে, উঃ—কি চমৎকার গান লেখেন আপনি! আচ্ছা, নাম করুন দিকি আপনার সব চেয়ে ভালো গানের বইটার—

গীতায় ব্রহ্মবাদ—

উঁহু, কটোমটো নাম নয়—বেশ যে মিষ্টি-মিষ্টি শুনতে।

গীতাঞ্জলি বলে আর-একটা বই আছে—

হ্যাঁ, ও-ই হবে। আপনারা লেখেন—আর এরা কি যাচ্ছে· তাই লেখে বলুন দিকি।

কার বই ?

কে দেখতে যায়? নাম-টাম পড়িনে—ভিতরের মাল পড়ি খাওয়াদাওয়ার পর নবেল নিয়ে শুই। না পড়লে ঘুম পায় না, তাই পড়তে হয়। কিন্তু পড়া যায় না এমন জঘন্য—

অবহেলায় টেবিল থেকে বইটা ছুঁড়ে দিল বেবি। আমারই বই—হায় ভগবান! আমার সব চেয়ে চিত্তচমকদার উপন্যাস—স্বর্ণকঙ্কণ।

বেবি বলে, কি যে লেখে এরা! কলম ছেড়ে কোদাল ধরে না কেন ?

অতএব কোদালই ধরব, সর্বান্তঃকরণে এই সাব্যস্ত করলাম কোদাল ধরো, কলা-কচু আর্জাও, অধিক খাদ্য ফলাও। শুনলে তো বেবির মুখে—আগে খাওয়াদাওয়া, পরে ঘুম। ভর-পেট খেয়ে নিয়ে তবে তো নভেল মুখে দিয়ে পড়বে!

সুচরিতা

মহেন্দ্রঘাটে পদ্মা পেরিয়ে এসে পাটনা জংশনের ওয়েটিং-রুমে গাড়ির অপেক্ষায় ছিলাম। লোকটিকে দেখলাম সেইখানে।

সেও অপেক্ষা করছে। দেখা হল বছর পাঁচেক পরে—হ্যাঁ, পুরোপুরি পাঁচটা বছর কেটে গেছে তারপর।

খপ করে হাত এঁটে ধরলাম, সরে পড়তে না পারে। অনেক দিন ধরে খুঁজছি।

লোকটা হকচকিয়ে গেছে।

কে মশাই আপনি ?

চিনতে পারছেন না ? দেখুন তো ভালো করে। সেদিনও চেনেন নি আমায়। কিন্তু এত কাণ্ডের পরে এখনো কি অচেনা থেকে যাব ?

কি বলছেন ? আমি কি কোনদিন মশাই—

আজ্ঞে হ্যাঁ। রদ্দা কষিয়ে দিয়েছিলেন আমার পিঠে। জুয়াচোর মিথ্যেবাদী মাতাল বলে গালি দিয়েছিলেন। রিতা প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, আপনি তখন আমার স্বর্গীয় বাপ-পিতামহের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মনে পড়ল এবার ? লোক ভুল করেছিলেন। মিথ্যে বলে ঢাকা-ঢাকি করে লাভ নেই।

রিতা অর্থাৎ সুচরিতার সঙ্গে সে সময়টা জমজমাট অবস্থা। ঈশ্বর দুটো জিনিষ দিয়েছেন—ভাল চেহারা এবং অপর্যাপ্ত মিথ্যে বলার ক্ষমতা। ঐ দুটোর জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বেড়াই।

রিতা বিজয়গড়ের মেয়ে। বিজয়গড় নিশ্চয় বিশাল কোন

জায়গা—কোথায় যদিচ সঠিক বলতে পারব না। কারণ ভুগোল পড়া নেই। রেনি-পার্কের প্রকাণ্ড এক অট্টালিকায় থাকে, তারও নাম বিজয়গড়। বিঘে পাঁচেক জমির উপর বাড়িটা। তবু অহরহ রিতার খুঁতখুঁতানি—খাঁচার মধ্যে থেকে মরে যাচ্ছে সে। কলকাতার উপরে ফুলের বাগান এবং লন-সম্বলিত অট্টালিকা—রিতার কাছে তা-ও খাঁচা বিশেষ। বুঝুন। বিজয়-গড়ের আসল বাড়িটা অতএব অনুমান হয়, একটি তেপান্তরের মাঠ। আমি গিয়েছিলাম এই হাটে ছুঁচ বেচতে! নাকের জলে চোখের জলে ভাসমান হব, এতে আর বিস্ময়ের কি?

বিজয়গড়ের কম্পাউণ্ডের সামনে রোজ সন্ধ্যায় আমার ঝকঝকে মিনার্ভা-গাড়ি দাঁড়ায়। রিতা কলকণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়, উজ্জ্বল দু-পাটি দাঁতের হাসি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। প্রেম এমন প্রবল যে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে আমারই জন্য, গাড়ি ভালো করে না থামতেই দরজা খুলে পাশে এসে বসে। আমার ইচ্ছা, একটুখানি নেমে রিতার মা-বাপের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে চা-টা খেয়ে যাই, তা ঘটে ওঠে না কোনদিন। প্রিয়-সঙ্গের জন্য লোলুপ রিতা—অবসরের এক তিল অপব্যয় হতে দেবে না।

চা খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে না অবশ্য। কোনদিন চাঁদপাল ঘাটে কোনদিন বা চৌরঙ্গিতে। মোটরগাড়ি যদি মানুষ হত, হাত জোড় করে রেহাই চাইত আমার হাত থেকে।

আগে টাকা খরচ করতে হয়, সকল ব্যবসার এই রীতি। কিন্তু তিন তিনটে মাস কেটে গেল, সিকি পয়সা উশুল হবার

কোন লক্ষণ নেই। বাক্‌সর্বস্ব এমন ভালবাসার পিছনে কাঁহাতক ছুটোছুটি করা যায়? তা ছাড়া অবস্থাও ইতিমধ্যে অতিমাত্রায় সঙিন হয়েছে। ড্রাইভারি চাকরিটা খুইয়েছি। বাবু কি করে টের পেয়ে গেছেন, তিনি যখন ক্লাবে থাকেন আমি গাড়ি নিয়ে পালাই।

অতএব বেমালুম ডুব দিয়েছি। রেনি-পার্কের ছায়াও মাড়াই নে। যা-কিছু গতিগম্য শহরের উত্তর অঞ্চলে।

চাকররি চেষ্টায় সারাদিন টহল দিয়ে বাসায় ফিরছি, সচকিত হয়ে দেখলাম রিতা দেবী। বাপ-মাকে গোপন করে এসেছে, জানলে তাঁরা কখনো আসতে দিতেন না। এতটা পথ বেচারাকে তাই ট্রামে আসতে হল।

তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। বাসা দেখে অবাক হয়ে গেছে। যেমন আমি অবাক হয়েছি তাকে দেখে।

এই জায়গায় থাকেন আপনি?

সদম্ভে বললাম—হ্যাঁ, এসে উঠেছি এখানে। বাড়িতে আর যাব না। কক্ষনো না। নাই বা চড়লাম গাড়ি, না খেলাম কালিয়া-কাবাব! কেন, পায়ে হেঁটে চলে না মানুষ? খায় না ভাত-রুটি?

হয়েছে কি বলো দিকি? সমস্ত বলতে হবে আমায়।

বাবা কি বলেছেন শুনবে? ভাবতে গেলেও কান্না পায়। আমার মা বেঁচে থাকলে কখনো এমনটা হত না। এর পরে আত্মসম্মান নিয়ে যাওয়া চলে না আর ওখানে।

রিতা তিরস্কার করে, ছিঃ—বাপ-ছেলের মধ্যে আবার আত্মসম্মান! রাগ হলে আমার বাবাও কত কি বলে থাকেন!

দু-হাত জড়িয়ে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, এক হপ্তা দেখা নেই—তখনই বুঝলাম, ভয়ানক কিছু হয়েছে। আমি বলছি—বাবা যাই বলুন, তাঁর গালিগালাজ মনে রেখো না। বাড়ি চলে যাও।

না—

রিতা রুষ্ট হয়ে বলে, কি করবে তবে?

থাকব এই রকম। ট্যুইশনি জোটে তো করব একটা-দুটো। না জোটে, বেরিয়ে পড়ব কলকাতা থেকে।

আর আমি? খরকণ্ঠে রিতা বলে, আমার অবস্থাটা ভেবে দেখেছ? পাড়ার সবাই জানে আমাদের মেলামেশার কথা। বাইরের লোকেও দেখেছে। এই তুমি যাচ্ছ না—তাই নিয়ে দিনের মধ্যে বিশ বার মা আমায় বকাবকি করছেন। কিছু বলেছিস তুই নিশ্চয়, রাগারাগি করেছিস। বাছার মনে লেগেছে—তাই আসে না।

তাজ্জব লাগল। স্নেহশীলা মহিলাটিকে চোখের দেখা দেখলাম না—অথচ ইতিমধ্যে আমি বাছা হয়ে গেছি, মেয়েকে অহরহ বকছেন আমার এই কয়েকটা দিন না যাওয়ার জন্য।

রিতা বলে, শ্যামবাজারের মোড়ে মন্দার-দা তোমায় দেখলেন। কেঁদে কেঁদে মারা যাচ্ছি, আমার দশা জানেন তিনি—তোমার

পিছু-পিছু এসে বাসাটা চিনে গেলেন। ভাগ্যিস দেখতে পেয়ে
ছিলেন—নয় তো মরে গেলেও তুমি বোধ হয় আর খোঁজ
নিতে না।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি। কণ্ঠে কান্নার আমেজ এখনও। ত
ছাড়া এ গলিতে এমন সুবেশা নারীর আবির্ভাবে কৌতূহলী
অনেকগুলো চোখ এদিকে সেদিকে ঘুরছে। নর্দামার পচা গন্ধে
রিতা নাকে কাপড় দিয়েছে। ভাল ঘরের মেয়ে, আর তাকে
নরক-ভোগ করাতে চাই নে। বললাম, রাগ কোরো না
আমারও মনের অবস্থা বুঝে দেখ রিতা। কালই যাব আমি
গিয়ে সমস্ত বলব।

নিশ্চয় যেও। আগাগোড়া না শুনে আমি সোয়াস্তি
পাব না।

অত দূর রেনি-পার্ক অবধি নয় কিন্তু। গাড়ি নেই, বুঝতে
পারছ। মাঝামাঝি কোনখানে—ময়দানে পুকুরধারের সে
সবুজ বেঞ্চিটায়। কেমন ?

ভুলে যেও না। তা হলে আমায় আবার আসতে হবে।

রিতা আবদারের ভঙ্গিতে বলে চলে গেল। কিন্তু আ
কানে লাগল শাসানির মতো।

পালিয়ে পরিত্রাণ নেই, গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে ধরে
কলকাতা ছাড়তে হবে। কোথায় যাওয়া যায় ? খোঁজখবর নি
এবং বোঁচকা-বিড়ে বাঁধতেও দুটো-একটা দিন তো লাগবে!

একটু সকাল সকাল গিয়ে পড়েছি ময়দানে। বসে

অদৃষ্ট-চিন্তা করছি। প্রায় বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত অবস্থা। এম
সময় এই লোকটি।

লোকটি এসেই ঘুষি মারল আমার পিঠে। আমিও ক্ষে
উঠেছিলাম। গোলমালের মধ্যে সহসা রিতা এবং তার মন্দা
দা এসে উপস্থিত।

কি হয়েছে?

লোকটি ওদের সালিশ মেনে টানা এক গল্প বলে গেল
আমি নির্বাক হয়ে রইলাম।

মন্দার আগুন হয়ে বলে, শুনলে তো? ধাপ্পা দিচ্ছে—গোা
থেকেই আমি বলেছিলাম কিনা?

রিতাকে তারপর আর দেখি নি। ক্ষীণদৃষ্টি লোকটিকে পাঁ
বছর পরে এই পেলাম পাটনা স্টেশনে।

সেই পুরানো প্রসঙ্গ তুলতে লোকটি মরমে মরে গেল।

ছি ছি! কি কাণ্ড করেছিলাম সেদিন! আপনি নিতা
ভদ্রলোক বলেই চুপচাপ সয়ে গিয়েছিলেন। অন্য কেউ হ
ঐখানে আমাকে শেষ করে দিত। তার পরেই আমার সে
খাতকটার দেখা পাই। টাকাও আদায় হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার ভদ্রতা পুরোপুরি জানতে তখনো তার বা
ছিল। টেনেহিঁচড়ে প্লাটফরমের বাইরে নিয়ে চললাম পা
পিটুনি দিতে নয়—খাবার খাওয়াতে। খাওয়া অন্তে ি

দিল সাত টাকা দশ আনার। বিল চুকিয়ে পরমানন্দে গলাগলি হয়ে দু-জনে বেরোলাম।

রিতাকে আর দেখি নি, কিন্তু কিছু কিছু খবর রাখি। সেদিন কাগজে পড়লাম ওদের বিবরণ। পড়েছেন আপনারাও।

হাওড়ার পুল থেকে সেই যে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—লোকটা হল মন্দার (পিতৃদত্ত নাম—মাদার)। কিন্তু রিতা সঙ্গে ছিল; জলে ডুবেও রেহাই পায় নি। চেঁচামেচি করে লোক-জন ও মোটর-লঞ্চ জুটিয়ে আবার তাকে ডাঙায় তুলল।

আরও প্রকাশ, সুচরিতা বিজয়গড়ের অথর্ব গিন্নির মাইনে-করা নার্স—পাঁচটা থেকে ন'টা পর্যন্ত বাইরে বেরোবার ছুটি।

এবং সেই যে হাসি-মাখা ঝিকমিকে দাঁত, তার দুটো পাটিই বাঁধানো।

সতী সীমন্তিনী

বংশী-দাদার দুই সংসার। ভারি তোয়াজে আছেন। একদিন গিয়ে দেখি, স্নানের পূর্বে তেল মাখানো পর্ব চলেছে। জলচৌকির উপর মুদিত চোখে দাদা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন—ছোট বউ সর্ষের তেলের বাটি এবং বড় বউ গন্ধ-তেলের শিশি নিয়ে তেল মাখাচ্ছেন। বড় বউ মাখাচ্ছেন মাথায় ও

বুকে, ছোট বউ পায়ে ও পিঠে। খুব দলাই-মলাই চলবে ঘণ্টা খানেক, তার পরে স্নান। সে-ও হবে দুই বউয়ের মিলিত ব্যবস্থায়। বড় বউ গরম জলে গা ধোয়াবেন, গামছায় রগড়াবেন; ছোট বউ ঠাণ্ডা জল ঢালবেন মাথায়, তোয়ালে দিয়ে পরিপাটি করে মুছে টেড়ি কেটে দেবেন।

দেখে শুনে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বংশী-দাদার সুখ দেখে একটুখানি হিংসেও হয় মনে মনে। জগৎ-জনে দেখে চক্ষু জুড়াক। হালের ছোকরারা একটা বিয়ের নামে আঁৎকে ওঠে—নয়ন মেলে দেখে যাক, দুটো বিয়ের আমিরি আয়েশ। আগে তো সুবর্ণ-যুগ ছিল—যখন অসংখ্য বিয়ে চলত। কল্পনার চোখে সেকালের বহু প্রিয়া-বেষ্টিত পুরুষপুঙ্গবের ছবি অবলোকন করে নিজের গাল চড়াতে ইচ্ছে করে—হায়-হায়, এমন আহাম্মক পুরুষ জাতি! নিজেদের পায়ে কুড়ল মেরেছি বহুবিবাহের বনেদি রীতি বর্জন করে।

একদা গ্রীষ্মের দুপুরে বংশী-দাদাকে দাবার আসরে ডাকতে গেছি। সাড়া না দিয়ে ঘরে ঢুকে বিষম বেকুব হলাম। ছোট বউ ঘামাচি খুঁটছেন পিঠের দিকে শুয়ে, বড় বউ বাতাস করছেন এক পাশে ঝিমোতে ঝিমোতে। পায়ে জুতো ছিল না এই রক্ষা—পা টিপে-টিপে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম। এখন বুঝতে পারছি, দুপুরের আড্ডায় কেন পাওয়া যায় না

দাদাকে। যুগল লক্ষ্মীর মধ্যবর্তী ভাগ্যবান নারায়ণ—কোন দুঃখে তিনি দাবায় বসতে যাবেন ?

কিন্তু রাত্রের ব্যাপার আলাদা। ডাকতে হয় না, সকলে আগে চলে আসেন। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, ছেড়ে দিলে বৌদিদিরা ?

বলে এসেছি নাকি ? তা হলে আসতে দিত না ভায়া যত্নের ঠেলায় দম বন্ধ হয়ে আসে, পালিয়ে এসে নিশ্বা নিয়ে বাঁচি।

এক বাজি হয়ে যাবার পর বলি, আপনি উঠুন দাদা—

কেন ?

বৌদিদিরা হা-পিত্যেশ বসে আছেন।

কিছু ভেবো না। তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমি নিচ্ছে। আড্ডায় এসে প্রাণ বাঁচাই একলা আমার নয়—ওদেরও।

সেটা নিজের চোখেও একদিন দেখে এলাম বটে! বিষম বৃষ্টি সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে। পথে ঘাটে জল জমে গেছে বংশী-দাদার সঙ্গে হেরিকেন থাকে না। কোথায় জলকাদা আছাড় খেয়ে মরবেন—আলো নিয়ে আমি পৌঁছে দিতে গেছি।

দরজা ঝাঁকিয়ে ভেঙে ফেলবার অবস্থা—বৌদিদিদের সাড় নেই। ঝি এসে দরজা খুলে দিল।

দেখলে ভায়া ? আমি নেই, তাই এখন নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছে

আমিও ডাকাডাকি করি নে—চুপচাপ যেখানে হোক শুয়ে পড়ি। ডাকলে রক্ষে নেই—সমস্ত রাত্তির ঠায় বসে সেবা চলবে।

বলেন কি?

আবার গেরো কেমন! একজনে উঠে বসল তো আর একজনকে ডাকতে হবে না। আপনা আপনি কেমন টের পেয়ে যায়—সে-ও পাশ-মোড়া দিয়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে।

স্ত্রী-হত্যার দায়ে পড়বেন দাদা। আপনার কড়া হওয়া উচিত।

তা হয়েছি ভায়া। খুব কড়কে দিই এক-একদিন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারি, উসখুস করছে। তারপর সকালে উঠে দেখা যায়, দু-পাশে দু-জনে যথারীতি মড়া আগলে আছেন। ব্যাপার বুঝলে ভায়া? পাল্লা চলেছে—সতী সীমন্তিনী কেউ কারো কাছে হারবে না। না মরলে আমার অব্যাহতি নেই!

মাস কয়েক পরে একদিন পাগলের মতো আমার বাড়ি এলেন।

সিন্দুক খুলে দেখিয়ে দিয়েছি—সব ফক্কা। ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে মাটিতে পুতেছি, তার পরে পাশ-বই চোখের উপর মেলে ধরলাম। আর বাড়ি-মরগেজের একটা দলিল করেছি তোমার নামে—

হয়েছে কি?

তাতে যদি টান কমে। কিন্তু বিশ্বাস করে না, হরেক রকম

জেরা করে। একটু বিষ-টিষ জোগাড় করে দিতে পা
ভায়া, পথ সংক্ষেপ করে নিই? মরতেই তো হবে ওদে
ভালবাসার গুঁতোয়।

বংশী-দাদা মারা গেলেন। তুই বউয়ের টানাটানিতে নয়
ডবল-নিউমোনিয়ায়। অন্তর্জলিতে নামানো হয়েছে, তারস্বরে
নাম শোনানো হচ্ছে। কিন্তু বউদিদিদের দেখা যাচ্ছে না কেন?
আহা, পতিব্রতা নিষ্ঠাবতী—এত বড় আঘাত সহ্য করতে পারলে
হয়! কোথায় পড়ে কেঁদে ভাসাচ্ছেন—হয়তো বা অজ্ঞান
হয়ে পড়ে আছেন।

সেই জীবন্মৃতাদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ি। বসে
থাকতে পারলাম না মৃতের কাছে। উপরে নিচে কোথাও তাঁরা
নেই। মনের ব্যথায় জলে ঝাঁপ-টাপ দিলেন না তো?

রান্নাঘরে ছ্যাঁৎ করে ব্যঞ্জন সম্বরা দিল—উঁকি মেরে দেখি,
বড়-বৌদিদি।

কি করছেন?

রাক্ষুসীর কাণ্ড দেখ ভাই—

বলে ছোট-বৌদিদির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।
ঘরের একপ্রান্তে পা ছড়িয়ে বসে ছোট-বৌদিদি গোগ্রাসে
খাচ্ছেন তখন। মুখের বড় গ্রাসটা এক প্রবল ধাক্কায় উদরস্থ
করে ম্লান হেসে তিনি বললেন, মড়া বের করলেই শাঁখা ভাঙতে
হবে। মাছ খাওয়া চিরজন্মের মতো শেষ—

বড়-বৌদিদি অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তা বলে কড়াই-সুদ্ধ টেনে নিবি? ও যে দশজনের খোরাক! আমি কি করি ভাই—ও-বেলার জন্য ভাজা মাছ আর তো কাজে আসবে না—তাড়াতাড়ি তাই দিয়ে একটু ঝোল করে নিচ্ছি।

সহসা চমকে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, ও কি, নাম-শোনানো থেমে গেল যে! নিয়ে যাবে নাকি? একটু সবুর করতে বলো ভাই, দু-গ্রাস খেয়ে আসি। ছোট-রাক্কুসীই সব মাটি করে দিল।

এই লেখকের

দিল্লি অনেক দূর 'পুস্তকের নাম ইঙ্গিতপূর্ণ। স্বাধীনতার জন্য একদা যে দিল্লী চলো - ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল ভারতের পূর্ব দেশ হইতে দেশপ্রেমিক ফৌজের নেতার মুখে, সে ধ্বনি আজ থামিয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু দিল্লি এখনো দূরেই আছে, স্বাধীন দেশের সমৃদ্ধি এখনও আমরা লাভ করি নাই, এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা মরীচিকাই রহিয়া গিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলির উপর এক নূতন আলোকপাত হইয়াছে। কিন্তু মনোজবাবু দুর্দান্ত আশাবাদী লেখক, তাই তাঁহার গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত মনে সকল নৈরাশ্যের মধ্যেও একটা জীবনের ধ্বনি বাজাইয়া তোলে, মন আনন্দে ভরিয়া যায়। গল্পগুলির মধ্যে আগাগোড়াই একটা স্নিগ্ধতার সুর, সংযম এবং পরিমিতি উচ্চ শিল্পসুলভ'—যুগান্তর। দুই টাকা।

দুঃখ-নিশার শেষে ৩য় সং। 'বর্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল' – শনিবারের চিঠি। ২

উলু ২য় সং। 'অভিভূত-করা ট্র্যাজেডি গল্প।.. মনোজ বাবুর গল্পের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে বইখানি অবশ্যই অভ্যর্থনা পাইবে'— যুগান্তর। ২।০

একদা নিশীথ কালে শোভন সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিবান বই। 'হালকা লেখাতেও মনোজ বসুর ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবেন'—শনিবারের চিঠি। দুই টাকা।

কাচের আকাশ 'গল্প বলায় মনোজবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পুস্তকের সব গল্পগুলিতে পরিস্ফুট। পড়তে পড়তে মনে হয়, কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে— বড় মিষ্টি। ওস্তাদ বাজিয়ে অনেকে হতে পারেন, কিন্তু 'হাত মিষ্টি' সবার ভাগ্যে হয় না। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজ বাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা কম লেখকেরই আছে' – দেশ। দুই টাকা।

দেবীকিশোরী সম্প্রতি ২য় সং বেরিয়েছে। নানা গোলযোগে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরাধিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দুই টাকা।

বিপর্যয় রঙমহলে অভিনীত। 'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর, ডায়ালগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি, বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—আনন্দবাজার। দুই টাকা।

প্লাবন ৪র্থ সং। নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপিচাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'– যুগান্তর। ১॥০

বাঁশের কেল্লা ২য় সং। "The novel unfolds the epic story of India struggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful lumber the quie little village all over the Country......The author of BHULINA has added one more feather to his cap"—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। ২া৹

ভুলি নাই ২৩শ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। এই বইয়ে চিত্ররূপও অসামান্য সাফল্যলাভ করেছে। দুই টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী ৩য় সং। স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রং ছাপা, বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। ২৸৹

আগষ্ট, ১৯৪২ ৩য় সং। আগষ্ট-বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত বাংলা-সাহিত্যে অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস। 'In this volume Monoj Babu has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood had engulfed at the time and which he has knit together in integrated whole'—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। চার টাকা।

শত্রুপক্ষের মেয়ে ৩য় সং। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ, খরস্রোত বসতি বিরল চরের উপর দুর্দ্ধর্ষ মানুষের জীবন-চিত্র। 'Sj Monoj Bose has a striking manner of reproducing atmosphere—of bringing to the reader's mind the vast alluvial stretches, the mighty rivers in spate fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times'—অমৃতবাজার। ৩॥৹

যুগান্তর ২য় সং। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ। ছেলেমেয়ে হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দুই টাকা।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় সং। বাছাই-করা গল্পের সংকলন। একখানা বইয়ের ভি দিয়েই মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা। লেখ জীবন-কথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমি বইটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। পাঁচ টাকা।

খদ্যোত 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং দুইই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়। রস ঘনীভূত। দীপ্তি হীরকের, খদ্যো মিটিমিটি নহে। গল্পলেখক মনোজ বসুকে বুঝিতে হইলে এ বইখানি অবশ্যপাঠ্য'—যুগান্তর

নরবাঁধ ৪র্থ সং। 'একালের আরেক জন শক্তিমান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—ত 'মাথুর' নামক বড় গল্পটিতে এই বাল্য-প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন

বাস্তা অনুযায়ী, তেমনই-কাব্যরস সমুজ্জ্বল। রোমান্টিক ট্রাজেডী এখানে বাস্তব জীবনেই বৈষ্ণ ভাব-সম্মেলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর, তেমনই নির্মল। ভয় নাই, অকল্যাণের অভিশাপ নাই।...বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে ক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা-বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি য়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরে 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তা হ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে পারেন'—মোহিতলাল মজুমদার, র্শন। দুই টাকা।

থিবী কাদের? ৩য় সং। নবযুগের বলিষ্ঠতম গল্প। 'It is a departure in the fiction-literature of the province' মৃতবাজার। দেড় টাকা।

মর্মর ৪র্থ সং। 'যে retrospect, চিন্তার গম্ভীরতা এবং মনের বেদনাবোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্য্যায়ে গিয়া পৌঁছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে'— য়। আড়াই টাকা।

খিবন্ধন 'নূতন প্রভাত'-স্রষ্টার অগ্নিক্ষরা নবীন নাট্যসৃষ্টি। 'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য র তাঁবেদারদের সহায়তায় শাসকগোষ্ঠির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ক দুঃখবরণ ও মর্মচেরা আত্মদানের কাহিনীকে মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি যা উঠিয়াছে। আন্দোলনের গতিপথে উদয়াচলে নব সূর্যোদয়ের যুগান্তকারী ঘটনাকেও ক সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক্তন শহীদদের পরিবর্তনের উপভোগ্য চিত্রটির অপরূপ বিন্যাস নাটকখানিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া য়াছে'—যুগান্তর। দেড় টাকা।

তন প্রভাত ৫ম সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যাদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। জবাবু যে নূতনত্ব করেছেন, তা গতানুগতিক নাটকীয় প্রথা নয়'—অহীন্দ্র চৌধুরী। ধরণের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি'—নরেশ মিত্র। 'আপনাকে দ না দিয়া পারি না—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে'—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। দুই টাকা।

বীন যাত্রা ২য় সং। 'লক্ষ্মণ যাত্রার স্বল্প পরিসরকে নবীন যাত্রার আদিগন্ত পরিসরে রূপান্তরিত করা—এ শুধু মনোজ বসুর লেখনীতেই বুঝি '—দেশ। তিন টাকা।